দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭১ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ২৪ জুন ২০১৯।।
৮ আষাঢ় - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।।
website : www.eswastika.com

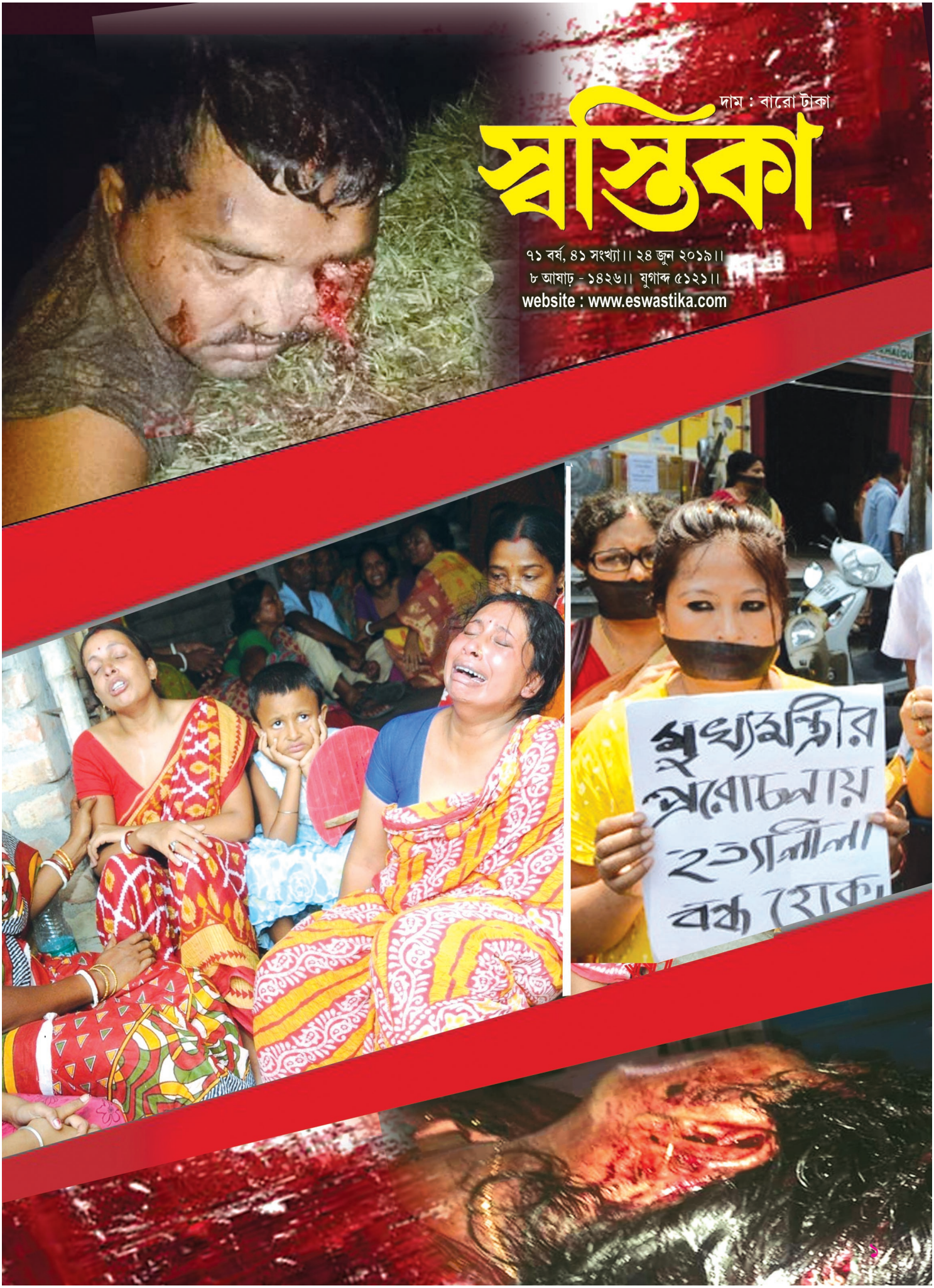

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ৮ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৪ জুন - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মমতার তোষণনীতি রাজ্যকে কোথায় ঠেলেছে এন আর এস চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল □ বিশ্বামিত্র □ ৬

খোলা চিঠি : হাটে ভাঙল দিদির হাঁড়ি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কংগ্রেস আজ শুধুই নেহরু-গান্ধী পরিবারের পদলেহী □ রবিশঙ্কর কাপুর □ ৮

জনরোষের ভয়ে প্রশাসনও এখন তৃণমূল নেতাদের ভরসা জোগাতে পারছে না □ সাধন কুমার পাল □ ১১

এরাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা কি অব্যাহত থাকবে? □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১৩

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন □ ডা: আর এন দাস □ ১৫

বেনোজল শুদ্ধ করতে হলে সংস্কার প্রয়োজন □ সরোজ চক্রবর্তী □ ১৭

দুধেল গোরুর খুরে রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২৩

কী চাইছেন মমতা? গৃহযুদ্ধ? □ সুজিত রায় □ ২৪

মমতা আদতে একজন নৈরাজ্যবাদী □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৬

পশ্চিমবঙ্গ 'সম্প্রীতির' আগ্নেয়গিরি □ অভিমন্যু গুহ □ ২৮

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের বোধোদয় কবে হবে? □ রাজু সরখেল □ ৩০

'চাল কুটতে হলো বেলা' □ চূড়ামণি হাটি □ ৩১

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৩৩

প্রথম আর্যভট্টের বৈপ্লবিক যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা □ বিকাশ কুমার ঘোষাল □ ৩৫

পশ্চিম বাংলাদেশ গঠনে মমতা ব্যানার্জির পদক্ষেপ □ স্বপ্নময় ভট্টাচার্য □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৭** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □ **খেলা : ৪১**□ **অন্যরকম : ৪২** □ **স্মরণে : ৪৫** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১ জুলাই
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
১ জুলাই
২০১৯

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ

আগামী ৬ জুলাই ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করব। স্বস্তিকার বিশেষ সংখ্যায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হবে। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য বিশ্বাস, সুজিত রায়, মোহিত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রী রাজধর্ম পালনে ব্যর্থ

নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র দেশের নজর কাড়িয়াছে। নির্বাচনের পরে এই রাজ্যে লাগামছাড়া সন্ত্রাসের ঘটনা সমগ্র দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে হতবাক করিয়াছে। সন্ত্রাসের এই মাত্রাছাড়া রূপ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে ধিক্কার দিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়াই বিচার করিতেছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে তিন-তিনটি সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হইয়াছে রাজ্য সরকারকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতও পশ্চিমবঙ্গে এই হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। সংসদের অধিবেশনেও এইবার পশ্চিমবঙ্গের এই পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই আলোচিত হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সকলেই যখন উদ্বিগ্ন— তখন একমাত্র নিরুদ্বিগ্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথিত আছে, রোম যখন জ্বলিতেছিল, সম্রাট নিরো তখন আপন আনন্দে বেহালা বাজাইতেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থাও ঠিক তাই। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা যখন একেবারেই বেহাল হইয়া পড়িয়াছে, তখনও তিনি ঠোঁট উলটাইয়া বলিতেছেন— 'সব ঠিক হ্যায়'। মৃত্যু মিছিল তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অনুতাপের সৃষ্টি করিতেছে না।

নির্বাচনের পরেই পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে, এমন ভাবিলে অবশ্য ভুল হইবে। সিপিএমের শাসনের অবসানে সকলেই ভাবিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গে বুঝি শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করিবে। কিন্তু বিধি বাম। গত আট বৎসরে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়াছে। সন্ত্রাসও মাত্রাছাড়া হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের সর্বস্তরে নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে। মহাবিদ্যালয়ের ভিতর শিক্ষকের উপর হামলা হইতে শুরু করিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীকে খুন করিয়া ফাঁসিতে লটকাইয়া দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই রাজ্যে প্রায় একশোজন রাজনৈতিক কর্মী হিংসার বলি হইয়াছেন। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের সময়ও বিভিন্ন অঞ্চলে শাসক দলের নেতা কর্মীরা অবাধে সন্ত্রাস করিয়াছে। নির্বাচনপর্ব মিটিয়া গেলেও এই সন্ত্রাস বিন্দুমাত্র কমে নাই। বরং, নির্বাচনের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উপর হামলা সংঘটিত করিয়াছে শাসক দলের কর্মীরা। বসিরহাটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে বিজেপি কর্মীদের। এরই পাশাপাশি নীলরতন সরকার হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর হামলা চালাইয়াছে কলিকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত ট্যাংরা অঞ্চলের সমাজবিরোধীরা। কোনো ঘটনাতেই প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে নাই পুলিশ। বরং, মুখ্যমন্ত্রী নানাবিধ উত্তেজক কথাবার্তা কহিয়া প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করিবার চেষ্টা যেমন করিতেছেন, তেমনই পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত ও জটিল করিয়া তুলিতেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে। রাজধর্ম সঠিকভাবে পালন করিয়া রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা মুখ্যত তাঁহারই দায়িত্ব। কিন্তু এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সেই দায়িত্ব পালনে তিনি পুরাপুরি ব্যর্থ। ব্যর্থ শুধু নন, এই দায়িত্ব পালনে তিনি বড়োই অনিচ্ছুক। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কোনোরকম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন না। অত্যাচারী স্বৈরশাসকদের মতো তিনিও সন্ত্রাসকে অস্ত্র করিয়াই ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন। ইতিহাস বলে, এই ধরনের স্বৈরশাসকদের পরিণতিটি বড়োই করুণ। জনরোষের সামনে শেষ পর্যন্ত তাহাদের রাজ্যপাট ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়। ক্ষমতায় মদমত্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি সেই ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কি জানেন— শেষের সে দিন ভয়ংকর?

সুভাষিতম্

বৃশ্চিকস্য বিষং পৃচ্ছে মক্ষিকায়াঃমুখে বিষম্।

তক্ষকস্য বিষং দন্তে সর্বাঙ্গে দুর্জনস তৎ।।

বিছার বিষ লেজে থাকে, মাছির বিষ মুখে থাকে, তক্ষকের বিষ তার দাঁতে থাকে, কিন্তু দুর্জনের বিষ তার সর্বাঙ্গেই থাকে।

মমতার তোষণ নীতি রাজ্যকে কোথায় ঠেলেছে এনআরএস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল

এই প্রতিবেদন যখন লিখছি, তখন রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্যা মেটার পথে। হ্যাঁ, সচেতন ভাবেই 'রাজ্য প্রশাসন' জাতীয় শব্দ বা 'মুখ্যমন্ত্রী' শব্দটিকে ব্যবহার না করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লিখছি। কারণ জুনিয়র ডাক্তারদের যাবতীয় ক্ষোভ, রাগ বা অভিমান যাই হোক না কেন, সেটা ছিল স্রেফ ব্যক্তি মমতাকে ঘিরে। ১৭ জুন তিনি জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এমন দরদ দিয়ে কথা বললেন, আর বয়সে নবীনরাও যেভাবে মন দিয়ে, একান্ত ভালো মানুষের মতো সব কথা শুনলেন তাতে কে বলবে গত সাত দিন ধরে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই কীভাবে ডাক্তারদের হুমকি দিয়েছেন, আর জুনিয়র ডাক্তাররাও তাঁর সঙ্গে বসা তো দূরের কথা, নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি সহ তাদের যাবতীয় রাগ উগরে দিয়েছেন।

অনেকে বলেছেন এনআরএস সমস্যা মেটাতে মমতা সাত সাতটা দিন সময় নিলেন কেন? অনেক আগেই তো আলোচনায় বসতে পারতেন। তাহলে ডাক্তারদের ধর্মঘটে বিনা চিকিৎসায় অনেক মানুষের প্রাণ যেত না। আবার কেউ জুনিয়র ডাক্তারদের ঔদ্ধত্যকেই দায়ী করেছেন, মমতা আলোচনায় ডাক দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সেই ডাক ফেরালেন কোন সাহসে? এখন সব ব্যাপারেই বিজেপি-জুজু দেখানো যাঁদের স্বভাব হয়ে গিয়েছে তাঁরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই বলে দিলেন এই সাহসে নাকি বিজেপির মদত রয়েছে ইত্যাদি।

আসলে মূল সমস্যা থেকে দীর্ঘকাল চোখ ফিরিয়ে আছি বলে, সমস্যা আর সমস্যা থাকবে না। তার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা ভাবলে কি আর চলে? ধরুন, আপনি কোনো সরকারি হাসপাতালে আপনার কোনো নিকট আত্মীয়কে ভর্তি করিয়েছেন, কোনো কারণে তার মৃত্যু হলে প্রাথমিক ভাবে আপনার মনে হতেই পারে চিকিৎসার গাফিলতিতেই হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে এবং অনেক সময় এই ধরনের অভিযোগ সত্যও হয়। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন, ডাক্তারদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠাও অসম্ভব নয় এবং এরকম হলে আপনার অন্য আত্মীয়রাই আপনাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে। শোক সামলে আপনিও হয়তো একটু শান্ত হবেন। অভিযোগ গুরুতর হলে আদালতের দরজা তো খোলা আছেই।

বিশ্বামিত্র-র কলম

ইদানীং যাঁরা 'বাঙ্গালি বাঙ্গালি' বলে চেঁচিয়ে প্রাদেশিকতা আর ঘৃণার বীজ ছড়িয়ে দেশের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টায় রত, তাঁদের জেনে রাখা উচিত, চিকিৎসার গাফিলতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটির নিকটাত্মীয়ের সংযত ও ভদ্র আচরণই তাঁর বাঙ্গালিত্ব নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি। দু'লরি ভর্তি লোক নিয়ে এসে নির্বিচারে চিকিৎসকদের ঠেঙানো কিংবা দু'চোখে স্বপ্নভরা এক সদ্য যুবকের স্বপ্নকে চির দুঃস্বপ্নে পরিণত করা কোনো বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য হতে পারে না। তসলিমা নাসরিন বিতাড়ন থেকে রাজ্য জুড়ে দাঙ্গা লাগানো, ঘরবাড়ি লুটপাটকে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার করে তোলা— বাম আমল থেকে তৃণমূল আমলে যারা এই এই সংস্কৃতির আমদানি করেছে তাদের কোনো 'বাঙ্গালি' পরিচয় থাকতে পারে না।

জুনিয়র ডাক্তাররা ক্ষমা না চাইলে মৃতদেহ ছাড়তে চায়নি বা মৃতের আত্মীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে তার জবাবে পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে মেরে প্রায় কোমাতে পাঠিয়ে দেওয়া বা কোনোক্রমে বাঁচিয়ে তুললেও জীবনে আর তাঁর সাঁতার না কাটা, দৌড়তে না পারা, চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা এবং অনার্সে তাঁর স্পেশ্যাল পেপার সার্জারি থাকলেও তিনি আর সার্জেন হতে পারবেন না--- এই পরিস্থিতি রাজ্যকে কতটা ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দিতে পারে, যাঁরা জীবন দান করেন তাঁদের জীবনকে বিঘ্নিত করা কতটা বিপজ্জনক তা যে কেউ বুঝবে।

যে মুখ্যমন্ত্রী এই গুন্ডাদের (খুব দুঃখিত, হামলাকারীদের বর্ণনায় এর চাইতে আর ভালো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না) সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারেন, 'কী এমন ইনজেকশন দিল যে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল', তাঁর কাছে আক্রান্তরা আর কী আশা করবেন। একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাতেও ধর্মঘটের রাস্তায় যেতে হলো তাঁদের। তবে লক্ষণীয়, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় এই 'দুধেল গোরু'-র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন যেভাবে এককাট্টা হয়ে হামলা চালিয়ে, পরে নামকাওয়াস্তে তার নিন্দা করে বা না করে অসুস্থ মানুষের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ঘৃণা ছড়াতে ব্যস্ত থাকেন শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণে, তখন বোঝাই যায়, রাজ্যের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ।

আর হবে নাই বা কেন? যিনি মুখ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকেও ভোটের ফলাফল দেখে বিন্দুমাত্র হায়াবোধ না রেখে বলে দিতে পারেন, 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়াও ভালো'-- তোষণনীতির পরিণাম ও ভয়াবহতা এখন পরীক্ষিত সত্য। এই মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যবাসী আর কণামাত্র বিশ্বাস করে না, কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন রাজ্যে সাধারণ মানুষের লাশের পাহাড় উঠলেও ক্ষমতা বজায় রাখতে ইনি তোষণ চালিয়েই যাবেন। আর জুনিয়র ডাক্তাররা তো ভুক্তভোগী, তাঁরা কেমন করে এনাকে বিশ্বাস করবেন।

এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি যে কতকাল চলবে এখনই প্রেডিক্ট করা সম্ভব নয়। তবে এর নিরসন দ্রুত প্রয়োজন, নইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। আজ জুনিয়র ডাক্তার, কাল পুলিশ, পরশু আইনজীবী কেউ না কেউ আক্রান্ত হবেনই দলমত পেশা নির্বিশেষে। ■

হাটে ভাঙল দিদির হাঁড়ি

মাননীয় জুনিয়র চিকিৎসকগণ,

এই চিঠি আপনাদের যখন লিখছি তখন সবে আপনাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক শেষ হয়েছে। আপনাদের জয়ের জন্য ধন্যবাদ দেব না, কারণ আদৌ জয় মিলেছে কিনা সেটা বুঝতে অনেক সময় লাগবে। আরও একবার হাসপাতালে হামলার আগে পর্যন্ত জয় উপভোগ করতেই পারেন। কিন্তু বাকি যে যে সমস্যার সমাধান আপনারা চেয়েছিলেন সেগুলির সমাধান না হলে কীই বা লাভ পশ্চিমবঙ্গের।

আপনাদের ধন্যবাদ জানাব একটি অন্য কারণে। আপনারা নবান্নে গিয়ে যা যা বলেছেন তাতে রাজ্যবাসী শুধু নয় দেশবাসীও জানতে পারল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতি করেছেন, করে চলেছেন বলে যে ঢক্কানিনাদ চালান সেটা কতটা মিথ্যা।

আপনারা যেমন হাততালি দিয়ে বৈঠক শেষ করেছেন তেমনই মুখ্যমন্ত্রীও হাসিমুখে আন্দোলনকারীদের 'লক্ষ্মী ছেলে' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু হাসির আড়ালে রয়ে গেল এক গুচ্ছ অস্বস্তি।

নির্বাচনী প্রচার কিংবা প্রশাসনিক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই রাজ্যের বদলে যাওয়া স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর অধীনে থাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রক যে সাধারণের জন্য অনেক কাজ করছে সেকথা বলেন। এদিন বৈঠকেও তিনি বাম আমলের সঙ্গে তুলনা করে নিজের সরকারের প্রশস্তি গেয়েছেন। বলেছেন, ২০১১ সালে স্বাস্থ্য খাতে ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। ২০১৮য় তা বাড়িয়ে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। বলেছেন, তাঁর স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প, হাসপাতালের বেড বাড়ানো, মেডিক্যাল কলেজে আসন বাড়ানো কিংবা শিশু চিকিৎসায় বদল আনার কথা।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মুখ্যমন্ত্রীকে নজর দিতে বললেন আপনারা মানে বৈঠকে হাজির জুনিয়র চিকিৎকরা --

১) কলকাতার হাসপাতালে বড়ো বড়ো গেট তৈরি হলেও জেলায় ও গ্রামাঞ্চলে বহু হাসপাতালে কোনো গেটই নেই।

২) উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই সিটি স্ক্যানের সুবিধা নেই।

৩) উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরেই রয়েছে অটো, টোটো স্ট্যান্ড।

৪) অনেক জায়গাতেই উন্নত যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে। জং ধরছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

৫) বড়ো হাসপাতালেও এক বেডে পাঁচজন রোগীকে আশ্রয় দিতে হয়।

৬) চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুর খরচই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় নয়। অনেকেই মনে করেন ২ টাকার টিকিট করলে সব সুবিধা মিলবে।

৭) ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আনতে দরকারি অ্যাম্বুলেন্স নেই।

৮) রাজনৈতিক দলের নেতারা হাসপাতালে এসে দাদাগিরি করেন।

(৯) সদ্যোজাতর চিকিৎসার জন্য অনেক হাসপাতালেই এসএমএসইউ হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় এনআরসিইউ বা পিআইসিইউ নেই।

১০) বহু হাসপাতালেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। রোগীর চাপে এপিডি চালাতে হয় বিকেল চারটে পর্যন্ত।

কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্প রাজ্যে চালু করতে রাজি নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি মনে করেন তাঁর স্বাস্থ্যসাথীই নাকি করে দেবে। সেটা যে কীরকম ভাবে আর কী করবে সেটা আপনাদের অভিযোগের তালিকাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই আগামীদিনেও আপনাদের সেই সব সমস্যা নিয়ে কাটাতে হবে। রাজ্যবাসীকেও ভুগতে হবে। কারণ, বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রাইসিস ম্যানেজ করেছেন। তাঁর ভাবভঙ্গিই বলে দিয়েছে স্থায়ী সমাধানের ইচ্ছা আদৌ নেই তাঁর। আসলে ওনার ঘর সামলানো দায় হয়ে উঠছে। রাজ্যের কথা মাথাতেও নেই। সেটা থাকলে আপনাদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করাতেন না রাজ্যকে।

—সুন্দর মৌলিক

কংগ্রেস আজ শুধুই নেহরু-গান্ধী পরিবারের পদলেহী

অতিথি কলম

রবিশঙ্কর কাপুর

পূর্বতন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি যতই বলুন যে পরাজয় বাস্তবে একটি অনাথ শিশু মাত্র, তার পিতৃত্ব বা মাতৃত্বে কেউই আগ্রহী নয়। তবুও এই অনাথ কিন্তু একজন অতি উর্বর পিতা হবার ক্ষমতাধর। পরাজয় জন্ম দেয় ব্যাপক দোষারোপের। ২০১৪ ও ২০১৯-এ পর পর কংগ্রেস দলের লোকসভায় দুটি পরাজয়ে যাবতীয় দোষের ভাণ্ডার নেহরু-গান্ধী পরিবারের দরজায় গিয়েই জমা হচ্ছে। এই অবস্থায় দৈবক্রমে মঙ্গলগ্রহের কোনো অধিবাসী যদি ২৩ মে-র পর আমাদের এখানে এসে পড়েন তিনি দেখবেন— একটি শতাব্দী প্রাচীন দল যা ভারত ইতিহাসের নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল সেই দলটিকে একটি অসৎ ও কুচক্রী পরিবার কেমন কুক্ষিগত করে ফেলেছেন।

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমার ধারণা কংগ্রেস কর্মীরা চাকরবৃত্তিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাঁরা জানেন যে তাঁদের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে শৃঙ্খলটিকেই ভালোবাসতে শিখে ফেলেছেন। গান্ধী পরিবার যে তাদের শেকল দিয়ে বেঁধে দাস বানিয়ে রেখেছে এটাকে তারা অত্যাচার নয়, বরং এক ধরনের সৌজন্য বলে মনে করে। এই পরিস্থিতিটি আমাকে পুরনো দিনের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র ভি শান্তারামের 'দো আঁখে বারো হাত' -এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক জেলর। যে ভূমিকায় নেমেছিলেন শান্তারাম স্বয়ং। এই আদর্শবাদী জেলর ভদ্রলোক ৬ জন দুর্ধর্ষ কয়েদিকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আনার চেষ্টায় তাদের খোলা জেলে রেখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কায়িক পরিশ্রম, খেলাধুলো ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হতে পারে। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম ও ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টা মেনে নিলেও স্বাধীন জীবনের ব্যাপারটা কয়েদিদের আদৌ হজম হচ্ছিল না। এই কয়েদিরা ইতিপূর্বে দীর্ঘদিন জেল খেটেছিল। তারা বন্দিদশাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চেন-খোলা অবস্থায় তারা রাতে কিছুতেই ঘুমোতে পারছিল না। তারা গোপনে নিজেদের চেন দিয়ে বেঁধে ঘুমোতে শুরু করল। ঠিক এই প্রতি তুলনাটিই মনে আসে নেহরু-গান্ধী পরিবারের শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুরাগীদের দেখে। বরাবর এই তথাকথিত প্রথম পরিবারটির নির্দেশে মাঠে ঘাটে চরতে অভ্যস্ত এই শ্রেণী অন্য কোনো মেষপালকের অধীনে চলতে অস্বোয়াস্তি বোধ করে।

> "বিজেপিতে বংশবাদের মারাত্মক ইনফেকশন দাঁত ফোটাতে পারেনি। কিন্তু দলীয় প্রধানের কাছে নতজানু হওয়ার সংস্কৃতি সব দলেই দিব্যি বলবৎ আছে। ১৯৮৫ সালে চালু হওয়া দলত্যাগ বিরোধী আইন দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তাদের দলীয় প্রধানদের কাছে নিতান্তই নতমস্তক করে রেখেছে। বাদানুবাদের জায়গা দখল করেছে নির্ভেজাল আনুগত্য।"

এই সূত্রে প্রবীণ কংগ্রেসি পি চিদাম্বরম সম্প্রতি অত্যন্ত আবেগ প্রবণ হয়ে রাহুল গান্ধীকে ইস্তফা দেওয়া থেকে নিরস্ত করতে লেগে পড়েছিলেন। অনেকের মনে পড়বে ১৫ বছর আগে ২০০৪ সালে যখন সোনিয়া গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করতে চান না (তার বহু কারণ ছিল সে সব অন্য প্রসঙ্গ) তখন বহু প্রবীণ পার্টিকর্মী নাকি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁরা তাঁকে মত বদলাবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তাঁরা কল্পনাও করতে পারছিলেন না কী করে পরিবারের বাইরের কেউ সর্বোচ্চ আসনে বসতে পারে। এখানে বলা নিশ্চিত প্রয়োজন যে একথা মোটেই ঠিক নয় যে অতীতে পরিবারের বাইরে থেকে আসা কোনো অ-গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর নাতিদীর্ঘ সময়সীমায় জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আর নরসিমহা রাও তো ছিলেন বিশাল এক নেতা। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চোখে এঁরা আদৌ তা ছিলেন না। তাঁদের মতে তো কেবলমাত্র গান্ধী পদবিধারীই একমাত্র সর্বোচ্চ পদের সত্ত্বাধিকারী।

সব থেকে অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে এই ধরনের চিন্তাধারা দলের মধ্যে যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত ও কুশলী সদস্যরাও সমানভাবে অনুসরণ করেন। চাকরবৃত্তির প্রতি তাঁদের এমনই মোহ যে তাঁরা তাঁদের থেকে বহু অংশে কম পারদর্শী ও অভিজ্ঞতায় বহুলাংশে

নীচের স্তরে রয়েছেন এমন লোকেদের আদেশ মাথা পেতে পালন করেন যদি সেই ব্যক্তির নামের শেষে গান্ধী পদবিটা ঝুলে থাকে। এই বিকৃত আকর্ষণ এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে ওপরে ওঠার ইচ্ছেটাকেও নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় এঁরা আজ দূর কল্পনাতেও ভাবতে পারেন না যে তাঁরা কোনো দিন উঁচু পদে পৌঁছবেন। তাঁদের কাছে এটা ধ্রুব সত্য যে দেশের গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি পরিচালনার একমাত্র অধিকার গান্ধীদের।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে দলের বর্তমান নেতৃত্ব যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। দেশের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সহ ১৮টি রাজ্যে কংগ্রেস দল ১টি আসনও পায়নি। বাস্তবে কয়েকমাস আগে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও ছুটকো ছাটকা কয়েকটা জায়গায় সফল হওয়া ছাড়া দল সারা ভারতে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এত কিছুর পরেও কংগ্রেসি নেতারা নেহরু-গান্ধী পরিবারের বাইরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁরা ভাবছেন প্রিয়ঙ্কা বঢরাকে আর একটু আগে আনলে কি ভালো হতো? নাকি তাকেই সরাসরি পরিবারের প্রথম উত্তরাধিকারী বলে ফতোয়া দিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে হতো?

অবশ্য ভারতে এই পরিবারতান্ত্রিক শাসন নিয়ে শুধু কংগ্রেসকে দোষ দেওয়াটা ঠিক নয়। প্রায় প্রত্যেকটি দলই এখানে এক একটি পারিবারিক উদ্যোগ। উলটো দিকে এর অন্যথা খুঁজতে গেলে আবার একদিকে অতি ক্ষুদ্র আর একদিকে অতিকায় দুটি মেরু দেখা যাবে। এক বামপন্থী দলগুলি অন্যদিকে বিশাল ভারতীয় জনতা পার্টি। ইতিমধ্যে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতাদের পুত্র কন্যারা অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রেও নজর কেড়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই কেবল বংশ কৌলিন্যের গুণে দলের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছননি। বামপন্থীদের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে তা সে তাদের আদর্শের মধ্যে যতই ভুল ত্রুটি থাকুক না কেন। আদর্শ ভিত্তিক দল হলেই সেখানে সর্বদাই ব্যক্তির চেয়ে দলের আদর্শই শিরোধার্য করা হয়।

সব কিছু মেনে নিলেও দেশের প্রাচীনতম দলের সমর্থকদের এমন অপরিবর্তনীয় ভাবে চিরকালীন দাসত্ববাদের অঙ্গীকার করে যাওয়াটা কেমন যেন আধিভৌতিক মনে হয়। তাঁদের আচরণের মধ্যে একটি নতুন তত্ত্ব মাথাচাড়া দেয়! যেমন একজন মানুষের মধ্যে যদি কোনো মুক্ত চিন্তক বেঁচে থাকেন, যদি প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরোধী কোনো বিপ্লবী বেঁচে থাকেন তাহলে তাঁদের মধ্যে একটি ভৃত্যও অবশ্যই টিঁকে থাকবেন। এখন বাস্তব পরিস্থিতি ও মতামতের স্বাধীনতা কতদূর প্রকাশিত হতে পারে এমন একটা আপাত নিরপেক্ষ পরিস্থিতির ওপরই নির্ভর করবে মুক্তমনা ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার পাবে নাকি বিক্ষুব্ধ মতাধিকারী সেই অধিকার পাবে নাকি আদতে সেই ভৃত্য মানসিকতার সমর্থকের ওপরই ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। হ্যাঁ, কংগ্রেস দলে নেহরুর পর থেকে শেষ তথা প্রধান পঙ্‌ক্তিতে থাকা ভৃত্য ঘরানার মানুষের ক্ষেত্রেই ক্ষমতার শিকে ছিঁড়বে।

দলের অভ্যন্তরীণ আবহ ও পরম্পরার চাপ কংগ্রেস দলকে দীর্ঘদিন ধরেই নেহরু গান্ধী পরিবারের এক ধরনের মহিলা-ভৃত্যের ভূমিকায় নামিয়ে এনেছে। অন্যদিক থেকে এই প্রথা দেশের গৈরিক দলটিকে কিন্তু অন্যভাবে প্রভাবিত করেছে। বিজেপিতে বংশবাদের মারাত্মক ইনফেকশন দাঁত ফোটাতে পারেনি। কিন্তু দলীয় প্রধানের কাছে নতজানু হওয়ার সংস্কৃতি সব দলেই দিব্যি বলবৎ আছে। ১৯৮৫ সালে চালু হওয়া দলত্যাগ বিরোধী আইন দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তাদের দলীয় প্রধানদের কাছে নিতান্তই নতমস্তক করে রেখেছে। বাদানুবাদের জায়গা দখল করেছে নির্ভেজাল আনুগত্য।

এর পরিণতি হয়তো সকলেরই নজরে পড়েছে। নেহরুর অনেক অনুরাগী ছিল। ইন্দিরার ছিল স্তাবক বাহিনী। নরেন্দ্র মোদীর রয়েছে বিশাল ভক্তের দল। একটু সময় লাগলেও বাজপেয়ী-আদবানী জমানায় তৈরি হয়েছিল একটি 'হাই কম্যান্ড'।

যাইহোক, কংগ্রেস নেতারা কায়মনোবাক্যে নিজেদেরকে ভৃত্যবৃত্তির কাজে নিযুক্ত রেখেছেন। সবদেশেরই গল্প কথার আছে— একজন বন্দিনীকে ঝকঝকে অস্ত্রধারী এক বীর সৈনিক এসে তার বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। কিন্তু হায়! এমন কোনও বীর কি পৃথিবীতে জন্মেছেন যে এমন এক বন্দিনীকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে যে বন্দিনী নিজের শৃঙ্খলকে ভালোবেসে ফেলেছে।

(লেখক টাইমস পত্রিকার কলামিস্ট)

পাত্রী চাই

পাত্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র,
34/5'7", B.Sc(H),
সরকারি চাকুরে।
আসানসোল।
ঘরোয়া পাত্রী চাই।
—যোগাযোগ—
০৩৪১২৩১২৪৭৬ /
৬২৯০০০৯৩৪১

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রম্যরচনা

পল্টুর জেল

পল্টুকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে গেছে। থানায় নিয়ে গিয়ে বেদম পিটানি দিয়েছে। পল্টু পিটানি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বড়োবাবুকে জিজ্ঞেস করল-- স্যার, আমাকে মারছেন কেন? বড়ো বাবু বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে 'পাগলি দেখবি তো কলকাতা চলে আয়' বলছিলিস কেন? পল্টু বলল, আমি তো ঠিক বলছিলাম স্যার। তাতে অপরাধটা কোথায়? আমি তো কারো নাম করিনি। বড়োবাবু বললেন, নাম বলিস তো কী হয়েছে। আমরা বুঝি জানি না কলকাতার পাগলি কে? পল্টু এখনো লক আপেই রয়েছে।

এরপর পল্টুকে পুলিশ বিচারপতির কাছে নিয়ে গেছে। বিচারপতি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, ও কী অপরাধ করেছে? পুলিশ বলল, ও রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পাগলি দেখবি তো কলকাতা চলে আয় বলছিল। বিচারপতি বললেন, ও বুঝেছি। তারপর খসখস করে কাগজে রায় লিখে বললেন, পল্টু, তোমার তিনদিনের কারাবাস। পল্টু বলল, বুঝেছি স্যার, জেলে যাওয়া মানেই অপরাধ নয়।

উবাচ

"আমি বিরোধীদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা সংখ্যার কথা ভুলে যান। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা বিশেষ করে সক্রিয় ভূমিকা খুবই জরুরি।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরেধীদের উদ্দেশে

"ভারতীয় ক্রিকেট টিম পাকিস্তানের ওপর আর একটা স্ট্রাইক করল। যেমনটি আশা করা হয়েছিল তেমন হয়েছে। এত ভালো ফল করার জন্য ভারতীয় টিমকে শুভেচ্ছা জানাই। সব ভারতীয়র কাছেই এই জয় গর্বের।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেটে ভারতীয় দলের জয়ের প্রসঙ্গে

"মোদীজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আমাদের শক্তিশালী সরকার রয়েছে। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য সরকারের শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স আনা উচিত।"

উদ্ধব ঠাকরে
শিবসেনা প্রধান

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

"এনআরএসে জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর হামলা করেছে দিদির আশ্রিত জামাতের লোকেরা।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি
তথা সাংসদ

এনআরএসে ডাক্তারদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে

"এশিয়ায় আমাদের সামনে 'গুরুতর হুমকি' হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। তাই সব দেশকে একজোট হয়ে সন্ত্রাবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামতে হবে।।"

এস জয়শঙ্কর
ভারতের বিদেশ মন্ত্রী

তাজিকিস্তানের দুশানবেতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

জনরোষের ভয়ে প্রশাসনও এখন তৃণমূল নেতাদের ভরসা জোগাতে পারছে না

সাধন কুমার পাল

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরের দিন অর্থাৎ গত ২৪ মে বিজেপির বিপুল জয়ের খবরের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শুনশান পার্টি অফিসের ছবি একাধিক বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। এরপর থেকেই সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে থাকছে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ও বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের জড়িয়ে নানা খবর। এই সমস্ত খবরের মধ্যে কমপক্ষে দুটি খবর মানুষকে ভাবাচ্ছে। (১) দখল হওয়া পার্টি অফিস তৃণমূলের হাত থেকে উদ্ধার করে বিজেপি সিপিএমের হাতে তুলে দিচ্ছে। (২) তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা সংক্রান্ত খবর।

বিজেপি সিপিএমের পার্টি অফিস উদ্ধার করে দিচ্ছে এরকম একটি খবরে এক ঝলকে এটা মনে হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে পা রেখে যারা রাজনীতি করেন তাদের বক্তব্য, এই ধরনের উদারতা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক অপরিপক্কতা, দূরদর্শিতার অভাবকেই প্রতিফলিত করে। কারণ মতাদর্শগত দিক থেকে বিজেপি ও সিপিএমের অবস্থান পরস্পর বিপরীত মেরুতে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিজেপির প্রসঙ্গ এলে অসভ্য বর্বর ছাড়া কথা বলতেন না। আর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর এস এস বিজেপির প্রসঙ্গ উঠলেই মাথা গুঁড়িয়ে দেব বলে হুংকার ছাড়তেন। এহেন সিপিএমের পার্টি অফিস বিজেপি উদ্ধার করে দিলে তা রাজনৈতিক আত্মহনন ছাড়া আর কী হতে পারে। বিজেপির হাত ধরে এ রাজ্যে 'পরিবর্তনের' পরিবর্তন প্রত্যাশী মানুষকে এই ধরনের রাজনৈতিক আত্মহননের সমতুল্য খবর হতাশ করবে এটাই স্বাভাবিক।

এই ধরনের সংবাদের ময়না তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল তৃণমূলের বর্তমান পার্টি অফিসগুলির সিংহভাগই এক সময় সিপিএমের পার্টি অফিস ছিল। কিন্তু লোকসভায় খারাপ ফলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের পার্টি অফিস খুলতে সাহস হচ্ছে না দেখে এবং এ ব্যাপারে বিজেপির কর্মীদের নীরবতার সুযোগে সিপিএমের লোকেরা গুটিগুটি পায়ে জনমানবহীন পার্টি অফিসগুলিতে ঝাড়া লাগতে শুরু করে। এ বিষয়ে আরেকটি মত হলো বামের ভোট যেন রামে না যায় সেজন্য পরোক্ষ ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসই সিপিএমের পার্টি অফিসগুলি খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এই ঘটনাকে সংবাদমাধ্যম একটু ফ্লেভার জুড়ে দিয়ে খবর করছে যে বিজেপি তৃণমূলের হাত থেকে সিপিএমের পার্টি অফিস উদ্ধার করে দিচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মী এমনকী মন্ত্রী, এমএলএ-রাও জনরোষের ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। কোনো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আক্রান্ত হলে থানায় অভিযোগ জানানোর মতো কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না। সাহসে ভর করে যারা বের হচ্ছেন তাদের সিংহভাগই জনরোষের মুখে পড়ছেন। দল বদল করে বিজেপিতে যোগদানের ফলে বিভিন্ন পুরসভা, গ্রামপঞ্চায়েতে ক্ষমতা হারিয়ে তৃণমূল ক্রমশই কোণঠাসা হচ্ছে। জনসমর্থন এতটাই তলানিতে নেমেছে যে প্রশাসন সক্রিয় হয়েও তৃণমূলের ভাঙন রোধ করতে পারছে না। সেজন্য তৃণমূল নেতাদের ঘিরে এই ধরনের ভিড়, বিক্ষোভ যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাম জমানার শেষের দিকে বামফ্রন্টের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের জনরোষ দেখা যাচ্ছিল বর্তমানে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এত কম সময় ক্ষমতায় থেকে তৃণমূল কেন এতটা জনরোষের মুখে পড়ছে?

> **সিপিএমের দীর্ঘ শাসনে তিতিবিরক্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে তৃণমূলের সস্তা চমকের রাজনীতিকে বেশি সময় দিতে রাজি নয় তা এবার লোকসভা নির্বাচনেই প্রমাণিত।... মানুষের এই বার্তা যারা পড়তে পারছে না তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে।**

এই জনরোষের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে তৃণমূল নেতাদের ঘিরে মানুষের এই ক্ষোভের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা। সিপিএমের দীর্ঘ অপশাসনের অন্ধকার, স্বজন পোষণ, দলতন্ত্র, লাল ফেট্টি বাধা জল্লাদদের হাড়হিম করা সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যখন রাজ্যের মানুষ ছটফট করছিলেন, সে সময় ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা চালায়, ঠিক তেমনি মমতা ব্যানার্জি তথা তৃণমূল কংগ্রেস নামক অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে রাজ্যবাসী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসযোগ্য এক সভ্য সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। ২০১১ সালে সিপিএমের কুশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার এই ভাবাবেগ এক নিঃশব্দ ইভিএম বিপ্লবের মাধ্যমে বামেদের সরিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল।

মানুষ ধরে নিয়ে ছিল মমতা ব্যানার্জি মানুষের ভাবাবেগকে সম্মান জানিয়ে নতুন নতুন মুখ এনে নতুন করে দল গড়ে নতুন করে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের বাঙ্গলাকে গড়ে

তুলতে শুরু করবেন। গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদ, পৌরসভাগুলির ঘুঘুরবাসা ভাঙতে গণতান্ত্রিক উপায়ে নতুন করে নির্বাচন করিয়ে জনসেবার প্রতি দায়বদ্ধ মানুষদের বসিয়ে সোনার বাঙ্গলা গড়ে তুলবেন। এই গড়ার প্রক্রিয়ায় হয়তো বা ভুল ত্রুটি হতো, সময় লাগতো, তাতে মানুষের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটতো বলে মনে হয় না। কারণ পথ সঠিক থাকলে কোনো কিছু গড়তে যে সময় লাগে তা মানুষ বোঝে। কিন্তু মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হতে খুব বেশি দিন সময় লাগলো না। মানুষ দেখলো জনরোষের মুখে পড়ে সিপিএম ও ফরোয়ার্ড ব্লকের যে সমস্ত নেতা-নেত্রীর ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার কথা অর্থাৎ রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটার কথা 'বদলা নয় বদল চাই' স্লোগান তুলে মমতা ব্যানার্জি সেই সমস্ত নেতা-নেত্রীর অধিকাংশকে সঞ্জীবনী প্রদান করে নিজের দলে টেনে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধীশূন্য করার পথে হাঁটলেন। সেই সংকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে কংগ্রেস, সিপিএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বিরোধী দল থেকে একের পর এক জনপ্রতিনিধি ভাঙাতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদ, পৌরসভা নামক 'সোনার খনি'গুলি তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণে এনে দলীয় কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে তোলাবাজি ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ লুটের খোলা অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

স্বাভাবিকভাবেই তিনি শুরু করলেন ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখানে সিপিএম শেষ করেছিল। ফলে দলতন্ত্র, স্বজনপোষণ, দম্ভ, অহংকার, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, ঘুষখোরি হয়ে উঠলো মমতা ব্যানার্জির শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। এক সময় দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড প্রবল প্রতাপশালী মুকুল রায়কেই তৃণমূলের সংগঠনের প্রাণ এবং রণকৌশলের নির্মাতা মনে করা হতো। যে সারদা মামলায় তৃণমূল দলটাই ডুবে গিয়েছে সেই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে মুকল রায়কে সিবিআই দপ্তরে হাজিরাও দিতে দেখা যায়। চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত হয়েও দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দলনেত্রী মমতার দম্ভ ও অহংকার এমন উচ্চতায় পৌঁছুল যে দল ছাড়তে বাধ্য হলেন সেই সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মুকুল রায়। নানা টানাপোড়েনের পর মুকুল রায় যোগ দিলেন বিজেপিতে। শুধু মুকুল নন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির অনেক নেতাই দল ছাড়লেন, বহিস্কৃত হলেন এবং মুকুল রায়ের পথ ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন। এদের কয়েক জন লোকসভার বিজেপির টিকিটে নির্বাচিতও হয়ে গেলেন। এখন জনরোষ এতটাই যে সদ্য অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে সরকারি মেশিনারি ব্যবহার করে ছাপ্পা চালিয়েও তৃণমূল কংগ্রেস ২২টির বেশি আসন জিততে পারলো না এবং এক ধাক্কায় বিজেপির আসন ২ থেকে বেড়ে ১৮ হয়ে গেল। শুধু আসন নয় বিজেপির ভোট শতাংশও অবিশ্বাস্য ভাবে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০.২২ শতাংশ হয়ে গেল। বিধানসভা ভিত্তিক হিসেব বলছে বিজেপি ১৩০টি বিধান সভায় জয়ী এবং ৩০ আসনে খুব সামান্য ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে।

বিজেপিতে যোগদানের পর মুকুল রায়ের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তৃণমূল ভাঙানোর কাজকেই তিনি নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন ও বিজেপিকে এগিয়ে নেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুকুল রায়ের এই দল ভাঙানোর খেলা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নবান্ন দখলের পথকে যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পথের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই তা স্পষ্ট হবে। এ রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে যে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা তোলাবাজি, জুলুমবাজি, সরকারি অর্থ তছনছ করা, বিরোধী দলের লোকেদের ধমকানো, অসম্মান করা তাদের অধিকার বলে মনে করে। উত্তরবঙ্গে বিজেপির ভালো ফলের পর তৃণমূলি তোলাবাজ, বামপন্থী তোলাবাজরা বিজেপিতে জায়গা করে নেওয়ার প্রয়াস চালাবে এটাই স্বাভাবিক। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নানা জায়গা থেকে তোলাবাজি ধমকানো চমকানোর যে সমস্ত খবর আসছে তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে তৃমমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর তোলাবাজরা রাতারাতি স্বঘোষিত বিজেপি হয়ে গিয়ে এই সমস্ত অপকর্ম করছে তাতে সন্দেহ নেই। বিজেপি এই সমস্ত অপকর্ম রুখে দেওয়ার প্রয়াস চালালেও সাংগঠনিক ভাবে যেখানে দল দুর্বল সেই সমস্ত জায়গায় রুখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

মানুষ মনে করে এইসব রাজনৈতিক অশিষ্টাচার রুখে দিয়ে এই রাজ্যকে রাজনৈতিক বিকৃতি থেকে উদ্ধার করে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা বিজেপির দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। প্রয়োজনে প্রশাসন মিডিয়া বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। লাভপুরের বিধায়ক মনিরুল ইসলামের মতো দাগিদের দলে নেওয়ার পর মানুষ কিন্তু বিজেপির শ্যামাপ্রসাদের বাঙ্গলা গড়ার লক্ষ্য ও সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও তৃণমূলি লুম্পেনদের নিয়ে দল ভারী করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যারা বিজেপিকে জানেন বোঝেন তারা এই দলবদলুদের নিয়ে দলভারী করার পদ্ধতি নিয়ে সংযত প্রতিক্রিয়া দিলেও আমজনতা কিন্তু বিষয়টি একেবারেই ভালো ভাবে নিচ্ছে না। কারণ যে দাগি নেতা-মন্ত্রীদের মানুষ শাস্তি দিতে চায় তারা রংবদল করে আবার রাজনৈতিক পূনর্জীবন পাক এটা মানুষ একেবারেই চায় না। তৃণমূল কংগ্রেসে দলবদল করে আসা বামপন্থীদের দাপট দেখে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সমস্ত দলবদলু রাজনৈতিক পেশাদাররা কুটকৌশলে এতটাই দক্ষ যে এদের সঙ্গে দলের পুরানো নেতা-কর্মীরা পেরে ওঠেন না। ফলে এক সময় ক্ষমতার রাস এই সমস্ত দলবদলুদের হাতেই চলে যায়।

মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু দলবদলুদের দেখে নয়, বিজেপিকে ভোট দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতাদের হাত ধরে এক নতুন ভোরের আলো দেখতে। সুতরাং মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ সিপিএমের দীর্ঘ শাসনে তিতিবিরক্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে তৃণমূলের সস্তা চমকের রাজনীতিকে বেশি সময় দিতে রাজি নয় তা এবার লোকসভা নির্বাচনেই প্রমাণিত। গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী সস্তা রাজনীতির ধারে কাছে না গিয়ে অনেকগুলি কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও মানুষ বিজেপিকে আরও বেশি ভোটে ক্ষমতায় ফিরিয়েছে। এতে প্রমাণ হয় জাতপাত, সংখ্যালঘু, কিংবা সস্তা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে ক্লান্ত মানুষ এখন গুণাত্মক রাজনীতিই পছন্দ করছেন। মানুষের এই বার্তা যারা পড়তে পারছে না তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেও এই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর। ■

এ রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা কি অব্যাহত থাকবে?

দেশকাল

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি আমাদের সপ্তদশ লোকসভা গঠনের জন্য দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এর ফলের ওপরেই নির্ভর করে সরকার গঠনের কাজটা। নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধান রচয়িতারা সরকারের ওপর আদৌ নির্ভর করতে চাননি, কারণ তাতে রাজনীতির স্বার্থবোধ নির্বাচন-ব্যবস্থাকে কলুষিত করার ফাঁক থেকে যেতে পারে। গণপরিষদে হৃদয়নাথ কুরু বলেছিলেন, 'democracy will be poisoned at the root।' এই কারণে তাঁরা একটা নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করেছেন যার কাজ হলো সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। আর সেই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে তাঁরা একটা পৃথক অধ্যায়ও সংবিধানে রেখেছেন। এমএল সিক্রির ভাষায়— 'India is perhaps the only country which has a chapter self-contained on the election in its constitution'--- (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৯৫)। এতে বলা হয়েছে— নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রনয়ণ নির্বাচন-তদারকি, পরিচালনা, ফল ঘোষণা ইত্যাদির জন্য একটা নির্বাচন কমিশন থাকবে। তার থাকবে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। এই জটিল কাজের জন্য কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে কর্মীবাহিনী চাইবে এবং নির্বাচন কর্মীরা তখন কমিশনের হয়েই কর্তব্য পালন করবেন।

এই বিস্তারিত ও জটিল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে একটাই কারণে। গণতন্ত্র আসলে জনগণের শাসন— নির্বাচনের মাধ্যমেই স্থির হয় কারা শাসন ক্ষমতায় বসবেন। সুতরাং নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বাধীন, স্বচ্ছ ও ন্যায়-ভিত্তিক মতেই হবে। ড. বি সি রাউত মন্তব্য করেছেন, 'The success of democracy depends upon fair and free election--- (ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২০১)। এই কারণেই রচয়িতারা এই ব্যাপারে সতর্কতা ও উদ্বেগ দেখিয়েছেন। যাতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কুক্ষিগত করতে না পারে, সেই জন্য সংবিধান পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও নিয়েছে। ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'Thus, elections in our country are centralised under the sole control of a single integrated body'— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৩৩৫)। শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নির্বাচন শেষ করার জন্য কমিশন পর্যাপ্ত রাজ্য-পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়োগ করতে পারে, রাখতে পারে যথেষ্ট সংখ্যক পর্যবেক্ষক ও প্রতিনিধি।

এত কিছু সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে— আমাদের দেশের নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও স্বাধীনভাবে হচ্ছে না। ৩২৬ নং অনুচ্ছেদ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকে ভোটাধিকার দিয়েছে যাতে তাঁরা স্বাধীনভাবে পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন। পরোক্ষ গণতন্ত্র এভাবেই বুলেটকে সরিয়ে ব্যালটের ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু ক্রমে বুলেটই কার্যত ব্যালটকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে কিছু কিছু ছাপ্পা ভোট পড়ত, দু-এক জায়গায় বচসা হতো, কেউ কেউ ফিরে আসতেন ভোট না দিয়েই। এখন কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে অপরাধ জগৎ জড়িয়ে গেছে, রাজনীতি ও গুন্ডামি একত্রিত হয়েছে। বুথ-জ্যাম্, বুথ দখল, দাঙ্গা, হামলা, ভীতি- প্রদর্শন, প্রাণনাশ, নির্বাচনকর্মীর ওপর আক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নির্বাচনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে। ড. এ. সি. কাপুর লিখেছেন, 'capturing of polling booths has now become a routine process by organised and armad

gange of hood-lums'--- (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, প. ৪২৫)। তাঁর মতে, এই ব্যাপারে শীর্ষ স্থানে আছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ— ('Bihar, West Bengal and UP fell pray to the violence and the Police had to report to firing'—ঐ)। এর পেছনে আছে রাজনৈতিক কর্ম ও তাদের কিছু নেতা। তাই প্রত্যেক নির্বাচনে গুলি চলে, বোমাবাজি হয়। বহু মানুষ তাতে হতাহত হন। বাদ যান না প্রিসাইডিং অফিসার ও অন্যান্য নির্বাচন-কর্মীরা। কারও কারও খণ্ডিত মৃতদেহ পাওয়া যায় নিকটবর্তী রেললাইনে।

এবারের নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি— বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গ সগৌরবে এই বিষয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে। এই অরাজকতাকে রোধ করার জন্য কমিশন নতুন নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু এ. এস. সি. কাশ্যপ জানিয়েছেন, এই নিয়ে কোনো কোনো সরকার বিরূপতা প্রকাশ করেছে— (আওয়ার কনস্টিটিউশন, পৃ. ২৫৬)।

নির্বাচনের আগে থেকেই বিভিন্ন নেতা প্রচারের নামে কুৎসা-খেউড় শুরু করেছিলেন। তাতেই বোঝা গিয়েছিল যে, এবার কমিশনের কাজটা কঠিন হবে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে যে নির্লজ্জ প্রহসন ঘটেছে, তাতে আশঙ্কাটা বেড়ে গিয়েছিল। এই কারণে কমিশন নির্বাচনকে পাঁচ দফা— এমনকী, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সাত দফায় ভাগ করেছিল। তাঁর যুক্তি ছিল, এতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পর্যবেক্ষকদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গায় নেওয়া যাবে। তাতে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছেন, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন। কেউ কেউ জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে টাকা ছড়ানো হয়েছে। কেউ বলেছেন— কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে কাজ করছে। কেউ ই.ভি.এম.-এ কারচুপির অভিযোগও তুলেছেন।

এটা লক্ষণীয় যে, পূর্ব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক জায়গায় নির্বাচন কর্মীরাই তাঁদের ও ভোটারদের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার দাবি তুলেছিলেন। তার ফলে ক্রমে এই বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কয়েকজন পর্যবেক্ষক মাইক্রো অবজার্ভার, বিশেষ নজরদারি ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু কিছুই কাজে দেয়নি। বিশেষ করে, এই রাজ্যে ভোটের দিন এমনকী, পরবর্তী দিনগুলোতেও অশান্তি, রক্তপাত, সংঘর্ষ, গুলি বোমা ইত্যাদি চলেছে প্রায় অবাধে।

অবশ্যই নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ রাখা নির্বাচন কমিশনের কাজ। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো ও বিভিন্ন সরকার সহযোগিতা না করলে আসল কাজটা হতেই পারে না।

আসলে, সমস্যাটা হলো— আমাদের নেতারা মনে রাখেন না যে, একটা নির্বাচনই শেষ কথা নয় উত্থান-পতন আছে। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল একচ্ছত্র ক্ষমতা হারিয়েছে। এবার তাদের আসনসংখ্যা ৫২। সঙ্গীদের নিয়ে ৯৪। এই রাজ্যে ৩৪ বছর একাদিক্রমে ক্ষমতায় থাকলেও বামপন্থীরা একটা আসনও এবার পাননি—৪০ জনের মধ্যে ৩৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সুতরাং বিজয়ীদের উচিত তাদের জয়ের কারণগুলো অব্যাহত রাখা, আর পরাজিতদের উচিত ব্যর্থতা নিয়ে 'পোস্টমর্টেম' করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়— এই ধরনের এলেম অধিকাংশ নেতারই নেই। তাই ক্ষমতা রক্ষা বা দখলই তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। নেতা, গুন্ডা, পুলিশ ও কিছু আধিকারিকের মাঝে মাঝেই মহামিলন ঘটে। কমিশন অনেক সময় কর্মী ও অফিসারদের বদলিও করে।

১৯৮২ সালে বিজেপি প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করে মাত্র ২টো আসন পেয়েছিল। সেই দলই কেমন করে ৬ বার কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে, ২৯টা রাজ্যের মধ্যে ২১ টাতে সরকার গঠন করেছে এবং এবার একাই ৩০১ টা এবং সঙ্গীদের নিয়ে ৩৫২টা আসন দখল করেছ, সেই রহস্যটা নিপুণ ভাবে ভেদ করতে হবে— বিরোধীদের এটাই হবে প্রধান কাজ। লাগাতার 'রাফাল' নিয়ে নিন্দা, সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চাওয়া, অন্যকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে মন্দিরে মন্দিরে 'শিবভক্ত ব্রাহ্মণ' সাজা, একই সঙ্গে ঈশ্বর ও আল্লা বলে প্রগতিশীল সাজা, সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা, পাকিস্তানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন, ইমাম ভাতা প্রদান, এন আর সি নিয়ে অপপ্রচার ইত্যাদি দিয়ে কাজ হয় না। বস্তুত নোটবন্দি, জিএসটি, 'চৌকিদার চোর হ্যায়', 'চা-ওয়ালা' ইত্যাদি নিয়ে প্রচার দেশের অধিকাংশ মানুষকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারেনি। তাছাড়া ঘটেছে 'হিন্দুত্ব' প্রতিক্রিয়াও। আর ২১টা দলের নেতাদের নিয়ে জোট গঠনের চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। কেউ এই ধরনের 'সবাই রাজা'র রাজত্ব চাননি। তবে একটা কথা বুঝলাম না— নির্বাচন কমিশনের কাছে ২০০০-এর বেশি রাজনৈতিক দলের নাম নথিবদ্ধ আছে--- এনডিএ-র বাইরের সবাইকে জোটের জন্য ডাকা হলো না কেন? দেশবাসী তাহলে একটা ডামাডোল দেখতে পেতেন।

সব শেষে একটা কথা বলি। হিন্দুত্বের জাগরণ, এনডিএ নেতৃত্বের সুশালীন রাজনীতি, বিচক্ষণ বৈদেশিক কূটনীতি, মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ব্যবস্থা ইত্যাদি তার সাফল্য এনে দিয়েছে। এটা লক্ষণীয়, উত্তরপ্রদেশে ৮০টির মধ্যে ৬২টা, অসমে ১৪ টার মধ্যে ৯টা, গুজরাটে ২৬টার মধ্যে ২৬টা, মহারাষ্ট্রে ৪৮টার মধ্যে ২৬টা, হরিয়ানার ১০টার মধ্যে ১০টা, মধ্যপ্রদেশে ২৯টার মধ্যে ২৮টা, বিহারে ৪০টার মধ্যে ১৭টা, ছত্তিশগড়ে ১১টার মধ্যে ৯টা, হিমাচলের ৪টার মধ্যে ৪টা, রাজস্থানে ২৫টা মধ্যে ২৪টা, জম্মু-কাশ্মীরে ৬টার মধ্যে ৩টা, উত্তরাখন্ডের ৫টার মধ্যে ৫টা, ত্রিপুরার ২টার মধ্যে ২টা, ঝাড়খন্ডের ১৪টা আসনের মধ্যে ১১টা, দিল্লির সবগুলো (৭), কর্ণাটকের ২৮টার মধ্যে ২৫টা, অরুণাচলের ২টার মধ্যে ২টা আসন এনডিএ দখল করেছে। ওড়িশা (৮), পঞ্জাব (২), গোয়া প্রভৃতি রাজ্যেও বিজেপি ভালো ফল করেছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী তার খাতায় বিজেপিকে শূন্য দিয়েছিলেন— সেটা এক অদ্ভুত ম্যাজিকে ১৮ হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যায়— জয়টা হয়েছে সার্বিক ও সর্বভারতীয়।

প্রধানমন্ত্রীর পদটা উত্তরাধিকারসূত্রে রাহুল গান্ধীরই পাওয়ার কথা ছিল। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ছিল— কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে তাঁরই মুখ্য ভূমিকা থাকবে। কারণ '২০১৯ বিজেপি ফিনিশ' হবে। চন্দ্রবাবু নাইডু প্রমুখ নেতাও অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু কথায় বলে— গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। চন্দ্রবাবুকে নিজের রাজ্যপাটই হারাতে হয়েছে।

কিন্তু এখন জরুরি কাজ একটাই। খুঁজতে হবে কারণ বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক কেন বলেছেন বিহারের চেয়েও এই রাজ্যে ভোট করা কঠিন? কেন? কেন তিনি আর আসবেন না? ▮

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন

ডাঃ আর এন দাস

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ তিনি আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়েছেন। কারণ তাঁর আঙিনায় ৪২টি ঘাসফুলের জায়গায় ১৮টি পদ্মফুল ফুটেছে যে! এখন আত্মসমীক্ষা করার উপযুক্ত সময় বটে! ম্যাডাম কি জানতেন না রাজ্যবাসীকে ঠকিয়ে কীভাবে আপনার দলটি লালু যাদবের দলের মতো বিত্তবান হয়েছে? আপনিই তো একদা বলেছিলেন, 'শুধু একাই খাবো, এমনটি হয় না। দলকে ৭৫ শতাংশ দিয়ে, বাদবাকিটা তোমরা নিজেরা খাও'। মনে পড়ে, চন্দননগরের প্রশাসনিক সভায় আপনি নিজের বিধায়ককে এই নির্দেশই দিয়েছিলেন? আপনার ভাই কালীঘাটের একটা ছোট্ট কুঠরির হার্ডওয়ারের দোকান থেকে কীভাবে ফেঁপেফুলে উঠল সেকথা রাজ্যবাসী জানে। আপনিই শুধু জানেন না! তিন ভাইয়ের বিপুল সম্পত্তির মালিকানার উৎস কোথায়? নামে বেনামে কালীঘাটের ২১টি জমি ও বাড়ির মালিকানা কার কাছে আছে? কালীঘাটে ভাইপোর রাজপ্রাসাদের অর্থের উৎসটাই বা কী? সারা বাঙ্গলায় সাদা-নীল রঙের ডিলারশিপ কার? 'জেনেসিস' বলে যে সংস্থাটি বিনা টেন্ডারে সমস্ত সরকারি অফিসের কাজ পায়, তার রহস্যটা কী? কার ঘরে ওই 'ডিভিডেন্ড' মানে লাভ্যাংশটা যায়? পুরীর 'রাজপ্রাসাদ' হোটেলটার মালিক কে? 'ফোর স্কোয়ার' গ্রুপের আবাসনে কার কালোটাকা খাটে? উত্তর দিন, জমি মাফিয়া 'নেওটিয়া'র আবাসন প্রকল্পে কার কালো টাকা খাটে? কার ইশারায় একের পর এক শিল্পের জমি হাত বদল হয়ে যায়? আত্মসমীক্ষা করুন আর তার সঙ্গে উপযুক্ত শুদ্ধিকরণও হোক! প্রথমে নিজের ঘর থেকে শুরু করুন— আত্মবিশ্লেষণের পালা! তবেই তো জনসাধারণ বিশ্বাস করবে যে, আপনি সত্যিই ফিরতে চান আপনার পুরানো সততার অবয়বে!

আগে নিজের ঘরের আত্মসমীক্ষা শেষ করুন। তা না হলে রোগ সারবে না। আজ সেই দুর্নীতি রোগ যে ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ায় পাড়ায়, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর প্রশাসনের কোণায় কোণায়! দমদমে নিজের খরচে ৮ জন বাউন্সার রেখেছেন মাসিক ১৫ হাজার টাকা মাইনেতে। তারা নাকি জনপ্রতিনিধি! কোথা থেকে আসে এত টাকা? মনে পড়ে ম্যাডাম, 'নবান্নে' একদিন এক সাংবাদিক আপনাকে একথা বলেছিলেন। আর তাকে আপনি কী বলেছিলেন 'ছেলেটা বড্ড দুষ্টু হয়ে উঠেছে'! সামান্য পঞ্চায়েতের প্রধান, তাঁর নিজের নামে নয়, স্ত্রীর নামে এক কোটি

"রামের নামে আপনার এত আপত্তি কিন্তু আপামর হিন্দু সমস্ত বিপদ ওই রাম নামেই খণ্ডন করে এসেছে এতদিন।"

টাকার 'ফিক্সড ডিপোজিট' করার সামর্থ্য কোথা থেকে পায়? আপনার এই গুণধরটি চৌধুরী মোহন জটুয়ার জন্য ৯টি বুথ লুঠ করে বিরোধীশূন্য করে তাকে জিতিয়ে দিয়েছেন। আপনি তার জন্য অনেক করেছেন আর সেও আপনার কাজ উদ্ধার করে দিয়েছে। ম্যাডাম, এই সেই 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'।

ভবিষ্যতে পারবেন তো তাকে সামলাতে? ২০০৯ সালে যখন আপনি রেলমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় ব্যবসায়ী মায়াঙ্ক জালান আপনার এক পোষা সাংবাদিকের সাহায্যে আপনার বাড়িতে এসেছিল। বন্ধ ঘরে একাকী দেড় ঘণ্টা ধরে তার সঙ্গে আপনি 'ডিল' করেছিলেন। রাজধানীসহ সমস্ত ট্রেনে তার কোম্পানি রেলে ঠাণ্ডা পানীয় সরবরাহের ঠেকা পেয়েছিল। সেই 'জালান কোম্পানিকে' ৪০০ কোটি টাকার মেট্রো ডেয়ারি মাত্র ৯০ কোটিতে রাজ্য সরকার বিক্রি করেছিল। আপনারই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ অসহায় ভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, সেই ঘটনার কথা— 'দিদির ইচ্ছাই শেষ কথা'।

মনে পড়ে, বাম জমানায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কা যখন বিনা নোটিশে হঠাৎ করে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছিলেন, প্রতিবাদে আপনি ফেটে পড়ে সি.ই.এস.সি-র অফিস ঘেরাও করেছিলেন? সঞ্জীববাবু আপনার পোষা সংবাদপত্রের মালিককে নিয়ে নিউ আলিপুরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গোপন আস্থানায় আপনার সাথে 'ডিল' করেছিলেন। তারপর গত ১০ বছরে আপনি কি আর কখনও আকাশছোঁয়া বিদ্যুতের দামের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেছেন? পাশের রাজ্য বিহারে যেখানে বিদ্যুৎ এক ইউনিট ২.৩০ পয়সা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৬.৩০ পয়সা! জনগণ বোঝে না আপনার 'সততার প্রতীকে'র রহস্যের কথা? আপনার ৮ বছরের রাজত্বে ১৪ বার বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। আপনার নীরবতার রহস্যটা কী

বলবেন দয়া করে? আগে নিজের ঘর পরিষ্কার করুন ম্যাডাম! এক অভিষেক ভাইপোর কারবারে আপনি নাজেহাল, পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে এরকম অসংখ্য ভাইপো আর ভাইয়েরা। তাদের সামলাবেন কী করে? আপনিই তো প্রতি ক্লাবে ২ লক্ষ টাকা করে দিয়ে সরকারি টাকায় আপনার বেসরকারি গুন্ডা পুষে রেখেছেন। বিনিময়ে তারা আপনাকে গণতন্ত্রের মোড়কে বিরোধীশূন্য করে ভোটে জিতিয়ে দিচ্ছে। জনগণ ঠিকই মনে রেখেছে, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৪ শতাংশ ভোটারকে আপনি বুথেই আসতে দেননি, ভোট দেওয়া তো দূরের কথা! নারী নির্যাতন, বুথ দখল, রাজনৈতিক হত্যাকে (৫২ জন) আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়েছেন! প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছেন। কাউকে গাঁজা, বেআইনি অস্ত্র, মদ ইত্যাদি বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছেন! ভোটে হেরে যাওয়ার পর, জল সরবরাহ বন্ধ করে, পাড়া থেকে সরকারি নলকূপ উপড়িয়ে ফেলে, রাস্তার ইট পর্যন্ত খুলে ফেলছেন! আপনার মতো স্বৈরাচারী রাজনৈতিক নেতা ভূভারতে কেন সারাবিশ্বেও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

দশটি আঙুল-সহ পুরো হাতটাই হিরে জহরতে মোড়া, গলায় কুকুরের উপযোগী সোনার মোটা চেন লাগিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রমোটার-কাম-তৃণমূলের নেতা! আহা! কী আপনার সততার স্বরূপ। আগে যারা বিড়ি মুখে সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াতো, এইসব দাপুটে নেতারা হঠাৎ কোথা থেকে বি.এম.ডব্লুউ গাড়ি পেল, বলুন তো? রাজারহাটে কোটি টাকার বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, দীঘার মন্দারমণিতে হোটেল, লাটাগুড়িতে রিসর্ট কিনেছেন ভাইপো। সেইজন্যে শাহরুখ খান আপনার 'ব্র্যান্ড আম্বাসাডর'। আর তাই আপনিই মোদীবিরোধী ব্রিগেডের প্রধান মুখ, তাই না? ১০০ দিনের 'জব কার্ডে' কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার টাকা পেতে কমিশন, এমনকী বিধবা বা বার্ধক্য ভাতা পেতেও কমিশন! বাড়ি করলে লোহার রড-সিমেন্ট কিনতে আপনার 'সিন্ডিকেট রাজ', সারা রাজ্যটাই চালাচ্ছেন কমিশনে! আজ পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ আর প্রশাসনকে করেছেন আপনার দলদাস। আই পি এস অফিসার বিনীত গোয়েলকে ডাকছেন 'এই বিনীত' বলে, পচানন্দকে ডাকছেন 'পচাদা' বলে! সারদা চিটফান্ডের আসামি রাজীবকুমারের সমর্থনে মেট্রোর সামনে বসছেন ধরনায়! এই রাজ্যে সরকারি উর্দিপরা পুলিশ ও সিভিকবাহিনী তৃণমূলের ক্রীতদাস! মানুষ বুঝতে শিখেছে। তাই ৪২ থেকে ২২ নেমে এসেছেন। চুরি, ডাকাতি, লুঠ এখন শিল্পের পর্যায়ে নেমে এসেছে আপনার দৌলতে! আপনার ভাই আর ভাইপোরা সেইসব শিল্পের রূপকার, তারাই আজ সফল শিল্পপতি! টাটা বিদায় নিয়েছেন সিঙ্গুর থেকে, আপনি এনছেন চপ তেলেভাজার শিল্প! আপনি মুসলমানদের তোষণ করবেন, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা বন্ধ করবেন, ১০,০০০ মাদ্রাসাকে সরকারি অনুদানের আওতায় আনবেন, হাইকোর্টের আইন অমান্য করে মুসলমানদের আজানের জন্য 'মুয়াজ্জিন ভাতা' দেবেন, উস্তী বাজার, কালিয়াচক, বাদুরিয়া, ক্যানিং আর বসিরহাটে দাঙ্গা লাগিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউড়াবেন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য রেশনকার্ড প্রদান করবেন, আর হিন্দুরা আপনাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করবে? ইভিএমে জিতে, গুন্ডামি করে বুথ দখল করে ২২টা আসন পেলেন, এখন সেই ইভিএমে দোষ দেখছেন। চাইছেন ব্যালটে ভোট। মানে আরও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভোট চুরি আর ছাপ্পা ভোট যা ছিল সিপিএমের অনন্য আবিষ্কার, সেটায় ফিরে যেতে! অর্থাৎ আপনিও ৩৪ বছর সেই একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করে থাকবেন। কান পাতলে শুনতে পারবেন অত্যাচারিত জনগণ বলছে, আপনি সিপিএমের চেয়েও সাংঘাতিক অত্যাচারী— 'এই তৃণমূল আর না, আর না'। ভাবুন ম্যাডাম, আপনার ওই গোঁয়ার খুনি গুন্ডা ভাইপোগুলোর কী হবে আপনি চলে গেলে? তারা যে অকালে মারা যাবে না খেতে পেয়ে! রামের নামে আপনার এত আপত্তি কিন্তু আপামর হিন্দুরা সমস্ত বিপদ ওই রাম নামেই খণ্ডন করে এসেছে এতদিন।

তাই সমস্ত হিন্দুদের কাছে, যারা তৃণমূল, কংগ্রেস অথবা সিপিএম করছেন, একটা সবিনয় অনুরোধ থাকল! একবার ভেবে দেখবেন, পশ্চিমবঙ্গের করুণ অবস্থাটার কথা! দেখুন লাভ, ল্যান্ড এবং ড্রাগ-জিহাদ আর নিরন্তর একমুখী ধর্মান্তরকরণ মানে শুধুই হিন্দু থেকে মুসলমান অথবা খ্রিস্টান হওয়া! শুধু হিন্দু মেয়েদেরকেই টার্গেট করা আর হিন্দু যুবকদেরই মেরে ফেলা হয় কেন! মন্দিরের তুলনায় কটা মসজিদ আছে আপনার আশেপাশে? অপরাধী বা হত্যাকারী মুসলমান আর অত্যাচারিত বা মৃত হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত কত? কখনও শুনেছেন কোনো মৌলবি জেলে গেছে? জানেন, হজের সাবসিডি আপনি দিচ্ছেন? প্রতিটি মোড়ে মসজিদ! দিনে পাঁচবার আজানের সাবধান বাণী! জানবেন, আপনি মূর্তিপূজক মুসরিক বা কাফের! সুতরাং আপনি একজন মুসলমান খুনির থেকেও জঘন্য! আপনার জন্য দোঝখের আগুন অপেক্ষা করছে! হিন্দু মানেই বিজেপি। তাই দ্বিখণ্ডিত ভারতেও আপনার ভোট দেবার অধিকার নেই। উদাহরণ ডায়মন্ড হারবার লাভপুর। আপনার জেহাদি ভাইয়েরা ডাক্তার পেটাচ্ছে। হাসপাতালে ভাঙছে। আর দেরি নয়, সমস্ত হিন্দুসমাজের সংগঠিত হওয়া জরুরি। আমাদের প্রধানশত্রু হিন্দুনামধারী অথচ কট্টর হিন্দুবিদ্বেষী ভ্রষ্ট ও লোভী রাজনেতারা। ২১টি বিরোধীদল সংখ্যালঘু ভোটের ভিখারি। তারা মুসলমানদের 'আল তাকিয়ার' কথা জানেন না। তারা সাময়িক সুখের আর সম্পদের কথা চিন্তা করে, সনাতন হিন্দু ধর্মকে, মাতৃভূমিকে আর হাজার বছরে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে, উষর মরুভূমির দেশ আরবের পদদলিত ক্রীতদাস হতে চাইছেন। তাই তারা হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলছে বছরের পর বছর ধরে। বর্তমানে যে ভাবে মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, অচিরেই নিজ দেশেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। আজ আর গান্ধী-নেহরু কেউ নেই কিন্তু তাদের কুকীর্তির দায়ভার আমাদেরকেই আজ বহন করতে হচ্ছে। আপোশ করে, তোষণ করে সমস্যার সমাধান হবে না। ■

বেনোজল শুদ্ধ করতে হলে সংস্কার প্রয়োজন

সরোজ চক্রবর্তী

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে মোদী ঝড়ে বিরোধীরা উড়ে যাওয়ার পরই শুরু হয়ে গিয়েছে ঘর বদলের পালা। কাতারে কাতারে অন্য দলের নেতা-নেত্রী ও কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করছেন। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠছে যে, বিজেপি কি বেনোজল আটকাতে পারবে? বাঙ্গলার আনাচে কানাচে— চায়ের ঠেকে, অফিসে, আড্ডার আসরে এই প্রশ্নটিই ঘুরে ফিরে আসছে। এরও সময়সীমা রয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন। তারা বলেন, বিজেপি একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ দল। এই রাজনৈতিক দলটির উত্থান ও উন্নতির পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদদের ভূমিকা রয়েছে। এই দুটি সংগঠন অনেকাংশে বিজেপিকে সমৃদ্ধ করে থাকে। বিজেপির বেশিরভাগ নেতা-নেত্রী এই দুটি সংগঠনের ঘরানায় লালিত পালিত হয়েছেন। একটা শৃঙ্খলাবোধ এই দুটি সংগঠনে রয়েছে। একমাত্র সেই শৃঙ্খলার বাঁধনে বেঁধেই বিজেপিকে বেনোজল আটকাতে হবে।

কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম থেকে এসে দলে দলে নেতা-কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন শুধু কি দেশসেবা করার জন্য নাকি নিজের সেবা করার জন্য? তবে দল পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণটি হলো নিজের অস্তিত্ব রক্ষার। হেরো দলের দল পরিবর্তন করা নেতারা কথাটা ভালোই বোঝেন। তাই যারা ক্ষমতায় আসতে চলেছে তাদের সঙ্গে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নতুন দলে গেলে নতুন পদ পাওয়া যাবে, পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা যেটা তিনি এতদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন তা অটুট থাকবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে রাজশক্তির মুখ হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চাবিকাঠিটি দল পরিবর্তনকারীদের কাছে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, বহু নেতা-কর্মীর দল পরিবর্তন করার কারণ নিরাপত্তাহীনতা। তারা যখন শাসকদলের নেতা ছিলেন তখন বিরোধীদের উপর হামলা করেছেন, আক্রমণ করেছেন। এবার মার খাওয়াদের দল যখন জিতে যায় এবং ক্ষমতায় আসে তখন পাল্টা আক্রমণ ও হামলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ ঋণ করে থাকলে তাকে তো তা শোধ নিতে হবে অর্থাৎ বদলা নেওয়ার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই সুযোগ বুঝে দল পরিবর্তন করে নিতে পারলেই এই সমস্যা থেকে অনেকটাই

রেহাই পাওয়া যাবে।

তৃতীয়ত, এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রী ও কর্মী আছেন যারা ভীষণ স্বার্থপর ও ধান্দাবাজ। নিজেরটুকু ছাড়া কিছুই বোঝেন না। তারা কংগ্রেসের জমানায় কংগ্রেস, সিপিএমের জমানায় সিপিএম, তৃণমূল জমানায় তৃণমূল করে এখন বিজেপিতে যোগদান করছেন। এভাবে জার্সি বদলাতে তারা অভ্যস্ত। এটাই এদের সংস্কৃতি বা কালচার। এরা কোনও সংগঠনের নীতি-আদর্শ মূল্যবোধের ধার ধারেন না। এরা সিপিএমের সেই নীতির সঙ্গে অনেকটা যুক্ত তা হলো— 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরা বাদ'।

সম্প্রতি বিজেপিতে এমন কিছু নেতা যোগ দিয়েছেন যারা দাগি দুষ্কৃতী, অত্যাচারী, জেহাদি বলে এলাকায় পরিচিত। দল জেতার পর নেতা হওয়া আর জেতার আগে নেতা থাকার মধ্যেকার তফাতটা বুঝতে হবে। জেতার পর নেতা হলে জয়ী দলের সুযোগ সুবিধা নিরাপত্তা পাওয়া যায়। কিন্তু যারা মার খেয়ে অত্যাচার সহ্য করে দলের শৃঙ্খলা মেনে, জীবনসংশয় উপেক্ষা করে দলের কাজ করেছেন, দলকে জিতিয়েছেন, তাদের গুরুত্ব কি নতুনের ভিড়ে হারিয়ে যাবে? নতুন দলে আসা ক্ষমতাবান অর্থবানরা কী দলটিকে পরিচালনা করবে? তারাই কি আরও অর্থবান ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠবে। আর দলের দুর্দিনের যারা একনিষ্ঠ কর্মী নেতা তারা এক ঘরে হতে হতে দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে— এটা কিন্তু ভাববার বিষয়। এ নিয়ে বিজেপি দলের কার্যকর্তারা নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করবেন এই আশা ও ভরসা আছে। কিন্তু যে বিষয়টি খুবই প্রয়োজন তা হলো দলের নবাগত নেতা- নেত্রী ও কর্মীদের দলীয় শৃঙ্খলা বোঝানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

বিজেপি দলে আজ যাঁরা প্রথম সারিতে রয়েছেন, যাঁরা মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন, তাঁরা সঙ্ঘ পরিবারের শৃঙ্খলায় বেড়ে উঠেছেন। তাই নবাগতদের আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করাটা বাধ্যতামূলক করা উচিত। আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগে তারা সুশৃঙ্খল হতে শিখুক, তারপর বিজেপির রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করুক। তা না হলে বিজেপি দলটার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। কারণ শৃঙ্খলা উন্নতির একান্ত সহায়ক। শৃঙ্খলা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করে। এজন্য জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্ব অপরিসীম।

নবাগতরা বিজেপিতে যোগদান করছেন দেশ সেবা করার জন্য। তাই তাদের প্রথমে অন্তত তিন বছর স্বয়ংসেবক হিসেবে কাজ করা উচিত। তারপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদে অন্তত দু' বছর কাজ করার পর বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসা উচিত। তবেই তারা দলের ভিতরে ও বাইরে নেতা-নেত্রীদের শ্রদ্ধা সম্মান করতে শিখবে। তাদের এটা বুঝতে হবে দেশসেবা করব বললেই করা যায় না। দেশের সেবক হতে গেলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। যোগ্য না হলে সেই দায়িত্ব পাওয়া যায় না। আর অযোগ্য ব্যক্তিরা এই দায়িত্ব পেয়ে গেলে দল ও দেশ দুটোই শেষ হয়ে যাবে। দলের বদনাম হবে।

রাজনীতিতে এই দল বদল নতুন নয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটি দল ভেঙে সমস্ত অচল নেতা আরেকটি দলে আশ্রয় নিলে নেতাদের অতীতের খারাপ কাজের দায় ও দুর্নাম দুটোই নতুন দলকে নিতে হবে। এটা বিজেপির পক্ষে সুখের ও শুভকর কখনই হবে না। যারা বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন, তাদের তাহলে কি দলে নেওয়া যাবে না? এই প্রশ্নের উত্তর হলো নতুনদের দলে নিতে হবে। তবে তাদের দলীয় নীতি, আর সাংস্কৃতি ও শৃঙ্খলা জানিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। যাতে তারা বিজেপিতে এসে অশান্তি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে না পারে। অন্য দলের কালচার বিজেপিতে আনা যাবে না। বিজেপিতে থাকতে হলে বিজেপির সংবিধান ও শৃঙ্খলা মানতে হবে। এখানে ব্যক্তি নয় দলীয় সংগঠন বড়ো। আর সংগঠন ব্যক্তিস্বার্থে নয় সমষ্টির স্বার্থে কাজ করবে।

যারা বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন তাদের নেওয়া হোক। এর জন্য যেমন স্বাগত জানানো হবে, তেমনি তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করার জন্য আর এস এস ও ভি এইচ পি-র সংগঠনে অন্তত পাঁচ বছর রাখাটাও বাধ্যতামূলক করা হোক। তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস থেকে এলে বিজেপিতে তাদের নেতা করে দেওয়া হলো, এমনটা যেন না হয়। এমন হলে বিজেপি দলটা পচা ও জঞ্জালের আস্তাকুঁড়ে পরিণত হবে। নীতি, আদর্শ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বলে কিছুই থাকবে না। দলের মধ্যে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। এটা বলে নয়, হাতে কলমে শিখিয়ে আর এস এসের প্রশিক্ষণের কষ্টিপাথরে বাজিয়ে পরীক্ষা করেই দেশরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। এরজন্য শৃঙ্খলা প্রয়োজন। শৃঙ্খলা শব্দের উৎস শৃঙ্খল শব্দ থেকে। শৃঙ্খল থেকে সুনির্দিষ্ট একটি কঠিন বন্ধন, শৃঙ্খলাও তেমনি সমাজজীবনের রীতিনীতি। শিক্ষাদীক্ষা, আচার, আচরণ মেনে চলার মানসিক বন্ধন। মানবসমাজ হলো একটি বৃহত্তর মানব সংগঠন। শৃঙ্খলা ছাড়া এই মানব সংগঠন এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। তাই মানবজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই শৃঙ্খলা ও দেশসেবা করার প্রশিক্ষণ দেয় আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাই বেনোজলকে শুদ্ধ করতে গেলে তাকে সংস্কার করা দরকার। তবেই ওইসব নেতা-কর্মীরা সংস্কৃতিবান হয়ে উঠবেন। তাদের এই সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলা শেখানোর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে নিতে হবে। তারপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মীয় বাতাবরণে লালিত পালিত করে সুশিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ ও সৎসঙ্গী করে তুলে বিজেপির নেতৃত্বে নিয়ে আসা উচিত অন্যদল থেকে আসা নবাগত নেতা-নেত্রী ও কর্মীদের। তবেই বিজেপির অন্দরমহলে সংস্কৃতি বজায় থাকবে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মোদীর হিন্দুত্ব এগিয়ে দিল বিজেপিকে

ভোটের আগে মোদীর দেখাদেখি বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এমন ভাবে পূজা পার্বণ শুরু করে দিল যা কস্মিনকালেও দেখা যায়নি। সত্যিকারের জাতীয়তাবোধকে মর্যাদা দিলে কারোই কিছু বলার থাকে না। কিন্তু বেশিরভাগ দলের বাড়াবাড়িটাকে একটা সাজানো নাটক বলেই মনে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দেশভক্তির মধ্যে কোনো ছলনা ছিল না। কিন্তু অন্য দলের বাড়াবাড়িটা লোক দেখানো বললেও কম বলা হয়। যেন স্বর্গের সিড়ি তৈরি করাকেও হার মানায়। সঙ্গে ছিল বেশির ভাগ দলের পাকিস্তান প্রীতি। ভেবেছিল পাকিস্তানকে তোল্লাই দিলে মুসলমান ভোট কবজা হবে। কিন্তু এরা বেশিরভাগই বুঝতে পারেনি। হিন্দুভোট এক হলে কেউই ধারে কাছে আসতে পারবে না। একথা স্বপ্নেরও অতীত। সেটা বুঝতে পেরেছিলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। প্রধানমন্ত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবধারাই ভোটে বাজিমাত করল। পুঁতে দিল হিন্দুত্বের গাছ। আর সেই গাছ-ই বিরাট মহীরূহে পরিণত হলো। বাংলাদেশে এখনো দুই কোটি হিন্দু আছে। তাদেরকে ভয় দেখিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। পলাশ রায়কে জেলের মধ্যে পুড়িয়ে মারা সেই কথাই প্রমাণ করে। ওখানকার রাজনৈতিক দলের ধারণা হিন্দুরা হলো কুকুর। খাবারের পর হিন্দু রূপী কুকুরকে তু করে ডাক দেবে আর ওরা খাবারের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করবে। আজও অফিস আদালতে ওখানকার কর্তা ব্যক্তিরা হিন্দুদেরকে মালায়ন সম্মোধন করে। সাপোর্ট-এর অভাবে সকল কটু কথা হিন্দুরা মুখ বুজে মেনে নেয়। যেমন এখানেও হিন্দুরা কোনো কোনো স্থানে মেনে নিত। এটাই হিন্দুদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবারের ভোট বিজেপি না জিতলে হিন্দুরা হারে হারে টের পেত। রামনাম কেন হরেকৃষ্ণ নামও ভুলে যেত। বাংলাদেশে এখন এমন হয়েছে যে, মোবাইল অন করলেই বিপরীত দিক থেকে ভেসে আসে আল্লার ধনি, আসসালাম ওয়ালাইকুম। সে হিন্দু মুসলমান সবার ক্ষেত্রেই। এখানেও হওয়া উচিত মোবাইল ফোন অন করা মাত্রই হরেকৃষ্ণ হরে রাম জয় শ্রীরাম নমস্কার জয় হিন্দ বা জয় মা কালী। তবেই ফিরে আসবে প্রকৃত জাতীয়তা।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

অথ বিদ্যালয় কথা

সংখ্যালঘু তোষণের নগ্নরূপ, মোটামুটি বাকি জনগণকে বোকা বানানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায়, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বছরের মতো কফিনের শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন শিক্ষাবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি দিদিমণির পার্শ্বচর শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু। এর আগের শিক্ষামন্ত্রী যিনি ছিলেন তিনি বিদ্যালয়ের একটানা পূজার ছুটিকে ব্রেক করে পড়াশুনার জন্য লক্ষ্মীপূজা থেকে কালীপুজার মাঝে স্কুল খোলা রাখতে ছুটি কমিয়ে দিয়েছিলেন।

এবারের পণ্ডিত শিক্ষামন্ত্রী অনেক অভিযোগ অগ্রাহ্য করে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা ও সংখ্যালঘুদের মন পাবার জন্য একটানা সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলির বারোটা বাজানোর এক অভিপ্রায়ে এই ব্যবস্থা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীও কিছু বললেন না তাঁর পার্শ্বচরকে।

বিদ্যালয়ের ছুটি বছরে ৬৫ দিন + রবিবার ৫২ দিন + আনুষ্ঠানিক + তৎকাল ছুটি সব মিলিয়ে প্রায় ৫ মাস থাকে। তাতেও সকল ছাত্র-ছাত্রীর কোর্স কমপ্লিট হয় না, শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বলে দেন বাড়িতে পড়ে নিতে। কারণ তিনিও তো প্রাইভেট টিউশন করেন সেটা বজায় রাখার জন্য কৌশলে এই ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

যাইহোক, তাদের হাতে রাখার জন্য আর একমাস পবিত্র রমজান মাসে রোজার জন্য পণ্ডিতমশায় কৌশলে এই কর্মনাশা ছুটির ব্যবস্থা করলেন। উনি মনে করেন উনি বুঝি বেশি বুদ্ধিমান। উনি জানেন কিনা জানি না যে রাজ্যের মানুষ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। তাদের বুদ্ধি কিছু কম নয়। বর্তমানে রাজ্যের শাসকশ্রেণীর বিরোধীগণ ধর্মঘট ডাকলে শাসকশ্রেণী সেটাকে কর্মনাশা দিন বলে

অভিহিত করেন। তাহলে ২৫ দিন ছুটির বদলে ২ মাস অর্থাৎ ৪০ দিন অতিরিক্ত ছুটি যেটা সংখ্যালঘু তোষণের নামে কৌশলে দেওয়া হলো সেটা কি শিক্ষানাশা দিন নয়? আসন্ন জুলাইমাসে ছাত্র-ছাত্রীদের যান্মাষিক পরীক্ষা। তাহলে ৪০ দিনের কোর্সটা কখন কমপ্লিট হবে, কী করে তারা পরীক্ষা দেবে এটা কি পণ্ডিতমশাইয়ের মাথায় একদম এলো না। সংখ্যালঘু তোষণের নগ্ন ভালোবাসার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ কুঠারাঘাত করলেন?

ভোটের জন্য তো এবারে বেশ কয়েকটি স্কুলে ছুটি গেল। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তো প্রায়ই মার দাঙ্গা হয়ে চলেছে। যেটা হয়ে চলেছে শিক্ষা নিয়ে সেটা মনে হয় সিপিএমের চৌত্রিশ বছরের অপশাসনেও এরূপ অরাজকতা হয়নি। সিলেবাসে মিথ্যা সংবাদ পুস্তকে ছাপা হচ্ছে ও তাই পড়তে ছাত্র- ছাত্রীদের বাধ্য করা হচ্ছে অর্থাৎ ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে নিজেদের অর্থাৎ শাসকদের সু চরিত্রের বর্ণনা যুক্ত পুস্তক তৈরি করে। ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মগজ ধোলাই করে তাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তাদের তথা সমাজের ও শিক্ষা ক্ষেত্রের ধ্বংস সাধন করবেন না। পণ্ডিত মহাশয়কে বলি আপনি শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রকে বাঁচান। ছাত্র-ছাত্রীরা আপনার মুখ চেয়ে আছে।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি

সম্প্রতি এ রাজ্যে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে গেছে। বিশেষত মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে এই ধ্বনি দেওয়ার কারণে প্রশাসনিক রদবদল পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। আসলে এ রাজ্যে ভোটের

ফলাফলে তৃণমূল নেত্রী যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন। কিন্তু 'জয় শ্রীরাম'— কথাটা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। বস্তুত শ্রীরামচন্দ্র সত্য, ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক। শ্রীরামচন্দ্র শুধু পৌরাণিক চরিত্রই নয়, একটা ঐতিহাসিক সত্যও বটে। মহর্ষি বাল্মীকি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নৈতিকতা এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে সেজন্য রঘুবংশের পূর্বপুরুষদের পরিচয় মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে মহাকবি কালিদাস রঘুবংশম্ গ্রন্থে রামচন্দ্রের পরবর্তী প্রজন্মের পরিচয় লিখে গেছেন। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে আছে। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র গল্প নয়, সনাতন ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রতীক। দেশ তথা জাতীয়তার প্রতীক। তাই শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি দেশের যে কোনো মানুষই করতে পারে। বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্য দিয়ে যেমন দেশের বন্দনা করা বোঝায়, তেমনই জয় শ্রীরাম ধ্বনিও দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। তাই এই স্লোগান নিয়ে কোনো বিতর্ক হতে পারে না। জয় শ্রীরাম বলার অধিকার সবার আছে এবং সংবিধান দেশের প্রত্যেক নাগরিককে বাক্ স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু এরাজ্যে এই স্লোগান নিয়ে যেন গণতন্ত্রের হত্যা চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী এই ধ্বনি বললেই গ্রেপ্তার করার কথা বলেছেন। কিন্তু কোন আইনের ভিত্তিতে তৃণমূলনেত্রী জয় শ্রীরাম বলা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করছেন সেটা কেউ জানে না। এ ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বাক্ স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার শামিল। ভগবান শ্রীরামের নাম মুখে আনা তাই চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কোন রাজনৈতিক দল কী স্লোগান দেবে তা নিশ্চয় তৃণমূল নেত্রীর ঠিক করে দেওয়ার অধিকার নেই।

এহেন ঘটনায় নেত্রীর বাড়িতে 'জয় শ্রীরাম' লেখা কার্ড পাঠানোর সিদ্ধান্ত সঠিক। পাল্টা হিসেবে 'জয় হিন্দ', 'জয় বাংলা' স্লোগানের ডাক দিয়েছেন নেত্রী। তাতে অসুবিধা নেই। দেশের নামে, রাজ্যের নামে জয়ধ্বনি সকলেই মেনে নেবেন। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তাছাড়া সারাদেশের কোনো রাজ্যেই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আর এই ধ্বনি সারাদেশে নতুন নয়। আর জাতীয়তাবাদী দলের প্রাথমিক ভিত্তিই হলো জাতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দুত্বের মিশ্রণ। তাছাড়া এ রাজ্যে জাতীয়তাবাদী দলের অভাবনীয় উত্থানের ফলস্বরূপ এরকম 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি আরও তীব্র আকার ধারণ করাটাই স্বাভাবিক। আর তৃণমূল নেত্রী এ ব্যাপারে যত ওভার রি-অ্যাক্ট করবেন তত জাতীয়তাবাদী দলেরই লাভ হবে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

২০১৯-এর নির্বাচনের সত্যদর্শন বাস্তব দিকদর্শন

ভারতের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন সদ্য সমাপ্ত, দ্বিতীয়বার মোদী সরকারের বিপুল জয় ও তার শপথ গ্রহণ হয়েছে। এ বিপুল জয় প্রমাণ করেছে দেশের মানুষ স্বার্থান্বেষীদের প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্বাচনে বিরোধীদের লক্ষ্য দলের চেয়ে ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীকে। তাদের স্লোগান ছিল মোদী হটাও দেশ বাঁচাও, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর মুখ দেখতে চাই না, হারামজাদা, এমনকী মোদীকে থাপ্পড় মারতে চাওয়া কান ধরে ওঠাবসা করতে চাওয়া, যা অমানবিক ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। দেশ বিভাগের দ্বারা স্বাধীনতার দুঃখ-বেদনা, ৭০ বছরে ৮০ হাজারের বেশি সেনার বলিদান, পুলওয়ামায় আক্রমণ ও বালাকোটে জইশ-ই-মহম্মদের শিবিরে বোমা বর্ষণ জাতীয় পরাক্রমেরই নিদর্শন। কিন্তু বিরোধীদের সেনাবাহিনীর প্রশংসা না করে জঙ্গিদেরই প্রশংসা, পাকিস্তানেরই প্রশংসায় দেশবাসী স্তম্ভিত, অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানকে দিতে চাওয়া, এন আর সি নিয়ে অসমে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অসমকে ৪টি ভাগে বিভাজনের স্বপ্ন দেখা, দেশকে আরও সন্তুষ্ট করার অপচেষ্টা রোধে জনগণমনে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে। জনগণমনের সত্যাদর্শন দিকদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে ও চেতনার উন্মেষ ঘটে। মোদী সরকারের ঘোষিত 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' নীতিকে জনগণের পূর্ণ সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী সরকারের বিপুল জয়, জনগণমনের পূর্ণ চেতনা।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবেরহাট, কোচবিহার।

হাসপাতালে জেহাদি হামলা কীসের ইঙ্গিত বহন করছে?

কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় চিকিৎসাকেন্দ্র বা চিকিৎসকদের ওপর চিকিৎসার গাফিলতির অজুহাতে আক্রমণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আক্রমণকারীরা এক বিশেষ সম্প্রদায়ের। কয়েক বছর আগে কলকাতার এম আর আই-এ ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের কয়েকশো লোক হামলা চালায়। কয়েকদিন আগে নীলরতন হাসপাতালে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় ট্যাংরা অঞ্চলের দুশো জেহাদি কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর হামলা চালায়। তাতে পরিবহ নামে এক জুনিয়র ডাক্তার গুরুতর আহত হন। প্রতিবাদে রাজ্যের প্রায় সব হাসপাতালে ডাক্তারবাবুরা কর্মবিরতির ডাক দেন। মনে প্রশ্ন জাগে, বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সাহস দেখায় কী করে? বর্তমানে রাজ্য সরকার এত নীরব কেন? এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমই বা কেন ডাক্তারবাবুদের কর্মবিরতিকে নিন্দা করে চলেছে? উত্তর জলের মতো পরিষ্কার। বর্তমান শাসক দলের মদতে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশ বানানোর মহড়া চলছে দিকে দিকে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এখনই সচেতন হতে না পারলে সর্বনাশ দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার হিন্দুরা শীতঘুম থেকে জেগে উঠুন।

—সত্যপদ সরকার,
ফাটাপুকুর, জলপাইগুড়ি।

মোদী সরকারই মহিলাদের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী

সুতপা বসাক ভড়

সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দলের বিপুল জয়ের পেছনে ভারতের মাতৃশক্তির অবদান অনস্বীকার্য। দেশের মহিলারা পুরুষদের থেকে বেশি ভোট দিয়ে এনডিএ-কে শক্তিশালী করেছেন। মোটামুটি দেখা গেছে যে, দেশের যেসব প্রান্তে এনডিএ-র সফলতা মিলেছে, সেখানে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি ভোট দিয়েছেন। যেসব জায়গায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি, সেখানেই বিজেপি এবং সহযোগী দলগুলি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। একটা তথ্য সুস্পষ্ট যে, গত ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার সর্বপ্রথম দেশের মাতৃশক্তির জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেয়। ছোটো ছোটো কিন্তু প্রভাবশালী এই পদক্ষেপগুলি মাতৃশক্তিকে সম্মান, সুরক্ষা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, যা পূর্বতন কোনো সরকার দেয়নি। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলারা— তাঁদের জন্য এইভাবে চিন্তা এবং কাজ করা এদেশে অভূতপূর্ব। মহিলারা কৃতজ্ঞ এবং উৎসাহিত হয়ে মোদী সরকারকেই পুনরায় চয়ন করতে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন, কারণ গত পাঁচ বছরে তাঁরা খুব ভালো করেই বুঝেছেন তাঁদের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কে বা কারা।

মহিলারা যে ২০১১ সালে বিজেপি সরকারকে পুনর্বার নির্বাচিত করেছেন, তার অন্যতম কারণগুলি হলো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা কেন্দ্রিক কিছু যোজনা; যেমন, মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ওয়ার্কিং উত্থান হস্টেল, মহিলা শক্তি কেন্দ্র যোজনা, মহিলা ই-হাট, উজ্জ্বলা যোজনা (গ্যাস সিলিন্ডার), পিএম আবাস যোজনা (থাকার জন্য বাড়ি), প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনা (বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ কানেকশান) ইত্যাদি। এই যোজনাগুলি সার্থকভাবে ভারতীয় মহিলাদের জীবনে কার্যকর হয়েছে এবং মহিলাদের জীবনযাত্রা সহজ করেছে, তাদের মান-সম্মান রক্ষা করেছে।

রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ, বাড়ি কিংবা শৌচালয়, অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ে প্রচলিত তিন তালাকের ব্যাপক প্রচলন— এসবের প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হলেন বাড়ির মহিলারা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারের পক্ষ থেকে ওইসব যোজনাগুলির লক্ষ্য ছিল মহিলাদের সার্বিক উন্নতিসাধন— এগুলি মহিলাদের ভীষণভাবে লাভান্বিত ও প্রভাবিত করে। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে এরই ফল প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের ১৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত প্রদেশগুলিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছেন। যে ১৩টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত প্রদেশে মহিলাদের ভোটের পরিমাণ বেশি ছিল, সেগুলি হলো উত্তরাখণ্ড, বিহার, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, গোয়া, কেরল, মিজোরাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু, লাক্ষাদ্বীপ, দমনদ্বীপ।

উদাহরণস্বরূপ, বিহারে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি ভোট দিয়েছেন। এখানে মহিলারা ৫৯.১২ শতাংশ এবং পুরুষেরা মাত্র ৫৫.২৬ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। বিহারের যেসব জায়গায় মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছেন, সেগুলি হলো সুপৌল (৭১.৬৪), কটিহার (৭২.৩৭), কিষাণগঞ্জ (৭০.৩৭), পুর্ণিয়া (৬৮.১৫), ছবরিয়া (৮৯.৩৯), বেগুসরাই (৬৭.১৩), শৈলী (৬৬.৬২), সমস্তপুর (৬৬.৭৪) এবং উজিয়ারপুর (৬৫.১২) শতাংশ, অথচ বিহারের মোট ৪০টি সংসদীয় সিটের মধ্যে কোথাও পুরুষরা ৬৫ শতাংশের বেশি ভোট দেয়নি। মহিলারা মোদী সরকারের ওপর বহু বেশি ভরসা করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রীর ১২টি মিছিলে। সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলছে, ২০১৪ থেকে বহু মহিলা রাজনীতিতে প্রকাশ্যে এসেছেন। নিজেদের ভালোমন্দ যা এতদিন আড়ালে ছিল, আজ তা প্রকাশ্যে এসেছে। সঙ্কোচ নয়, নিঃসঙ্কোচে নিজেদের অসুবিধার কথা বলার ক্ষমতা এসেছে আপামর মহিলাদের মধ্যে। তারা জানেন যে, সরকার আছে তাদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য।

তাঁদের বিশ্বাস ভরসা কেবলমাত্র বর্তমান সরকারের ওপর। সুতরাং গত পাঁচ বছরে ভারতের মহিলারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার থেকে যে ভরসা, বিশ্বাস পেয়েছে এবং উপকৃত হয়েছে, তারই কৃতজ্ঞতা তাঁরা প্রকাশ করেছেন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় পূর্বতন সরকারকে চয়ন করে! ■

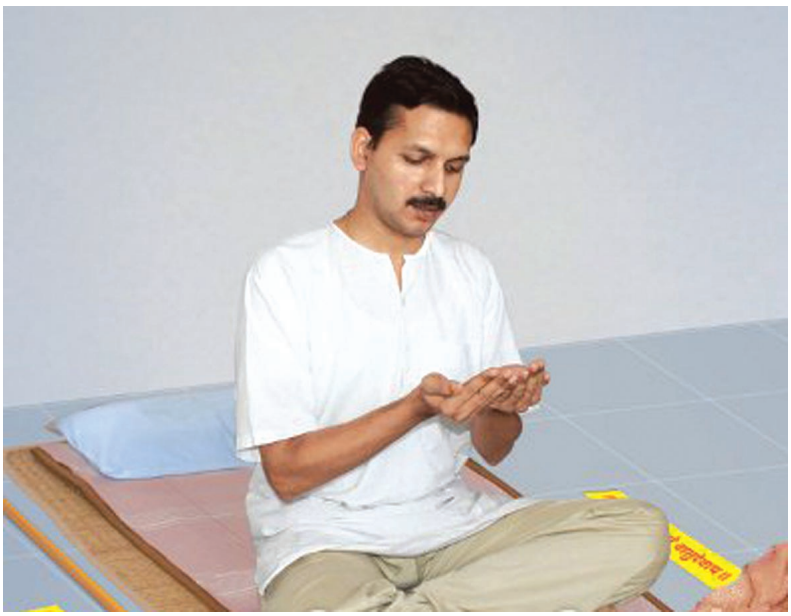

নিয়ম মেনে শয়ন ও শয্যা ত্যাগ সুস্থ জীবনের সহায়ক

অসিতবরণ আইচ

শয়ন

● শয়নের ভঙ্গিমার উপর অনেকটা নির্ভর করে আমাদের নিদ্রা ও স্বাস্থ্য।

● পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে শয়ন করতে হয়।

● পা-দুটো টান করে রাত্রে বামদিকে ও দিনে ডানদিকে কাত হয়ে শুতে হয়।

● কোলবালিশে পা তুলে ঘুমানো অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

● রাত্রে ডান নাকে ও দিনে বাম নাকে শ্বাস চলাকালীন ঘুমোতে হয়।

● তুলোর বালিশে মাথা দিয়ে তুলোর তোষকেই ঘুমানো স্বাস্থ্যকর।

● জাজিম ব্যবহার না করে শুধু পাতলা তোষক বা তুলোর কম্বলের ওপর শয়নই স্বাস্থ্যকর।

● খাটিয়া বা ঝুলন্ত ক্যাম্প খাটে শোওয়া স্বাস্থ্যকর নয়।

● উলঙ্গ হয়ে শয়ন নিষিদ্ধ। সুতি ও পশমী ছাড়া অন্য পোশাক পরে শয়ন অস্বাস্থ্যকর।

● মশা থাক না থাক মশারির মধ্যেই শয়ন করা উচিত।

● কোনোরকম ধোঁয়া বা গ্যাস শয়নকক্ষে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

● বালিশ ছাড়া বা হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

● পায়ে মোজা ও মাথায় টুপি পরে শোওয়া ভালো নয়।

শয্যা ত্যাগ

● শয্যা ত্যাগের প্রকৃষ্ট সময় সূর্যোদয়ের ৯৬ মিনিট পূর্বে। (চার দণ্ড। এক দণ্ড সমান ২৪ মিনিট)।

● একজন সুস্থ ব্যক্তি রাত্রি ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে ভোর চারটের সময় শয্যাত্যাগ স্বাভাবিক হবে।

● শয্যাত্যাগের পূর্বে চিৎ হয়ে শুয়ে দুটো হাত দুই হাঁটুর পাশে রেখে, পা ও হাতের আঙুলগুলো একসঙ্গে ভাঙতে হবে। পায়ের পাতা সামনে পিছনে চাপ দিতে হবে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড।

● ক'টি উত্থানাসন ১০ সেকেন্ড। পবনমুক্তাসন ৩০ সেকেন্ড।

● নিজের দু'হাতের পাঞ্জা পরস্পর লাগিয়ে 'করাগ্রে বসতে লক্ষ্মী... প্রার্থনা করে এবং সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে যথা 'প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ...' ইষ্টদেব-দেবীর নাম জপ করতে করতে শয্যা ত্যাগ করতে হয়।

● শয্যা ত্যাগ মানে দিনের শুভ উদ্বোধন। সুন্দরভাবে শুরু হলেই সুন্দরভাবে শেষ হবে।

● প্রত্যেক দিনই নতুন দিন। বিধাতার দেওয়া এক অনুপম আয়ু-প্রসাদ।

● মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাণ। প্রতি সেকেন্ড-মিনিট- ঘণ্টা, দিন- মাস, বছরের সমষ্টি এই প্রাণ। বুদ্ধি-মন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা এই প্রাণের সেবা করার পবিত্র সংকল্প প্রভাতেই করতে হবে।

● চিৎ হয়ে শয্যাত্যাগ করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

● যে কোনো একদিকে, বিশেষ করে বামদিকে কাত হয়ে উঠলে ভালো হয়।

● শয্যা ত্যাগান্তে লম্বা লম্বা শ্বাস নেওয়া ছাড়া করতে করতে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে হয়। ■

দুধেল গোরুর খুরে রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ

সন্দীপ চক্রবর্তী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেবেন। এখন তিনি সেটাই করছেন। আর তার এই বুঝে নেওয়ার দোসর হয়েছে দুধেল গোরুরা। উপমাটি স্বয়ং মমতার। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান তোষণের অভিযোগ নতুন নয়। এতকাল তিনি ওই অভিযোগ হয় এড়িয়ে গেছেন নয় তো অস্বীকার করেছেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে শোচনীয় ফল করার পর আর কোনও রাখঢাক রাখেননি। স্পষ্টই বলেছেন, যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি সহ্য করতে হয়। এখানে মমতার গোরু মুসলমানেরা। তিরিশ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের হুকুম পেলে তারা লাঠি-বন্দুক ধরেন। বোমা ছোঁড়েন। দু-চারটে লাশ ফেলে দেন। এই সন্ত্রাসই মমতার ভাষায় দুধ। মুসলমানের ভোটও দুধের সমগোত্রীয়। সুতরাং একুশের বিধানসভা নির্বাচনে দুধেল গোরুরাই যে তার প্রধান ভরসা সেটা মমতা বিলক্ষণ জানেন। তাই মুসলমানরা যতই লাথিঝাঁটা মারুন মমতা কিছু মনে করেন না।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে গোরুদের দাপাদাপি। বস্তুত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেওয়ার হাতিয়ার গোরু অর্থাৎ মুসলমানেরা। বসিরহাটের ন্যাজাটে এই দায়িত্ব পালন করেছেন শাহজাহান শেখ। কে এই শাহজাহান শেখ? তার একটি পরিচয় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা। কিন্তু ন্যাজাট থানার ভাঙ্গিপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, অনেক আগে থেকেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে লুঠপাট, ডাকাতি আর তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। এমনকী, ২০১৭ সালে বসিরহাটে হিন্দুদের ওপর যে হামলা হয়েছিল তার সঙ্গেও শাহজাহানের যোগ ছিল বলে অনেকে বলছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটে কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু হারলেও ভালো ভোট পেয়েছেন। মুসলমানদের একটা অংশও যে তাকে ভোট দিয়েছেন সে খবরও

শাহজাহান শেখ

আছে। সুতরাং বিজেপির ভোটারদের ভয় দেখাতে শাহজাহান শেখেদের মতো দাগি অপরাধীদের ব্যবহার করে বিজেপি নেতাদের খুন করানোটা মমতার মাস্টারপ্ল্যান। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। হিন্দুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। তারা বিজেপিকে ভোট দেবার কথা ভাববেন না। অন্যদিকে মমতা মুসলমানদের কাছে আরও একটু বিশ্বস্ত হয়ে উঠবেন।

তবে বিজেপি নেত্রী সরস্বতী দাসকে যেভাবে খুন করা হয়েছে তাতে সকলেই শিউরে উঠেছেন। সরস্বতীদেবীর মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসার ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ন'টা গুলি করা হয়েছে তার মাথায়। বিজেপির দাবি তৃণমূলের গুন্ডারা সরস্বতীকে খুন করেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে খুন হয়েছেন সরস্বতী। পুলিশও সেই লাইনেই তদন্ত শুরু করেছে।

বলা বাহুল্য, তৃণমূল এবং পুলিশের যুক্তি আদপেই ধোপে টেকে না। সরস্বতী একজন সাধারণ গৃহবধূ। থাকতেন হাসনাবাদের টাকিপুর গ্রামে। তার ব্যক্তিগত জীবনে এরকম কোনও ভয়ংকর শত্রুতা থাকার অবকাশ নেই বললেই চলে যা একদিন খুনোখুনিতে পরিণত হতে পারে। তাছাড়া, যেভাবে সরস্বতীকে খুন করা হয়েছে সেটা কোনও পেশাদার খুনির কাজ। যে ব্যক্তি খুন করেছেন তিনি পেশাদারও বটে, প্রতিশোধপরায়ণও বটে। নয়তো কেউ মাথায় ন'টা গুলি করে না। সরস্বতীর মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসার পরই খুনি ক্ষান্ত হয়। আগেই বলেছি এটা কোনও সাধারণ খুনির কাজ নয়। এমনকী, এই নিষ্ঠুরতা কোনও অ-মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে দেখানো সম্ভব কিনা তাই নিয়েও তর্কের অবকাশ রয়েছে। হাসনাবাদ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই সে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ তদন্তের নামে প্রহসন শুরু করেছে বটে কিন্তু আসল অপরাধীরা ধরা পড়বে না। এখানেও উঠে এসেছে সেই গোরু-তত্ত্ব। আসল অপরাধীরা সকলেই নাকি মুসলমান।

বস্তুত, রাজনীতির নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার অসূয়ানীতি ছড়িয়ে দিয়েছেন দলের মধ্যে। যার নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছে চিকিৎসকদের সাম্প্রতিক ধর্মঘটে মমতার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তিনি হুমকি দিয়েছেন চিকিৎসকদের। মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষী আক্রমণের শিকার ডাঃ পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে একবার দেখতে যাবার আগ্রহ দেখাননি। এখনও পর্যন্ত সাড়ে সাতশো সরকারি চিকিৎসক ইস্তফা দিয়েছেন। ভেঙে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা। অথচ মমতা নির্বিকার। তিনি হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি মেরুকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশ্য সভা থেকে বখাটে ছেলেদের চাকরি দেবার কথা ঘোষণা করছেন। এসব দেখে মনে হয় তৃণমূল দলটা আদৌ থাকবে তো? নাকি এক রাজনৈতিক উন্মাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে ভবিষ্যতে জেহাদি সংগঠনে পরিণত হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে। তবে একটা কথা এখনই বলা যায়। মমতা ছিলেন বাঙ্গালির চোখের মণি। এখন তিনি চোখের বালিতে পরিণত। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চোখে ভালো করে জলের ঝাপটা না দিলে বাঙ্গালির চোখ কিন্তু জ্বলতে থাকবেই।

হাসনাবাদে নিহত বিজেপি কর্মী সরস্বতী দাস।

কী চাইছেন মমতা? গৃহযুদ্ধ?

সুজিত রায়

লোকসভা ভোটের ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে চরম অশনি সংকেত, একথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর থেকেই গোটা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে হিংসাত্মক রাজনৈতিক হানাহানি। প্রায় সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসের একচেটিয়া আক্রমণ রাজ্যের জেলায় জেলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করছে। ঘরে ঘরে যুবক এবং তরুণদের টেনে বের করে হয় পিটিয়ে, না হয় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে যারা হচ্ছে। রেহাই মিলছে না মা- বোনেদেরও। বাধা দিতে এলে তাদের ওপরও পড়ছে উপর্যুপরি চপারের আঘাত। গ্রামবাঙ্গলার আনাচে কানাচে লুকিয়ে রয়েছে অত্যাচারী সুপারি কিলাররা। কখনো বাইক বাহিনীর দুরন্ত রক্ত জল করা হুংকার, কখনও বা মোটা মোটা বাঁশের আগায় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে শাসানি। কখনও প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখানো তো কখনো বা মা-বোনেদের ইজ্জত লুটে নেওয়ার চরম হুংকার।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চাপা সন্ত্রাসের সূত্রপাত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। কখনও পার্কস্ট্রিটের সুজেট-ধর্ষণের ঘটনায়, কখনও বা কামদুনির 'নির্ভয়া' ধর্ষণের ঘটনায়, কখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কখনো বা পশ্চিম মেদিনীপুরে— একটার পর একটা ঘটনায় যেভাবে তিনি সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তা নজিরবিহীন। '২০১৯ বিজেপি ফিনিশ' স্লোগান তুলে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে নিজেই ফিনিশ হয়ে যাবার পর যেদিন প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, 'রাজ্যের জন্য একটু বেশিই কাজ করা হয়ে গেছে। এবার আর বদলের রাজনীতি নয়, দরকারে বদলার রাজনীতিই করব', সেদিন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষের ওপর। যেখানে যেখানে হেরেছে শাসক দল সেই সমস্ত এলাকার মানুষের ওপর আছড়ে পড়েছে সশস্ত্র আক্রমণ। এবং এই সমস্ত আক্রমণে সাহায্যকারী হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে রাজ্য পুলিশকে প্রত্যক্ষ ভাবে। কারণ পুলিশের নাকের ডগাতেই খুন হলেও পুলিশ চেয়ারে বসে হাওয়া খেয়েছে— যে প্রমাণ বার বার উঠে এসেছে। অতি সম্প্রতি সন্দেশখালিতে দুজন তরতাজা যুবক খুন হয়ে যাওয়ার পরেও ছবিটা বদলায়নি। এমনকী দলীয় কর্মীদেরও শানিত আক্রমণের শরিক হতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন খুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা ভোটের পর দলীয় পর্যালোচনা সভায় দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন দলীয় কর্মী মোক্তার হোসেনকে। কারণ ওই মোক্তার হোসেন হুগলীর বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিকে নির্বাচনী বুথে ঢুকতে না দিয়ে 'গণতান্ত্রিক নজির' সৃষ্টি করেছেন। বীরভূমের বীর রাজনীতিবিদ অনুব্রত মণ্ডলকে দিয়ে বলানো হচ্ছে— 'যদি কেউ ভাবে ঝামেলা করব, মস্তানি করব, তাহলে রাজি আছি। যদি ভেবে নেন তৃণমূল ঘরে বসে আছে তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।' মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক শীর্ষকর্তার চেয়ারে বসে নির্দেশ দিচ্ছেন— 'বিজয় মিছিল করা যাবে না।' ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীকেও সভা করতে দিতে বাধা দিয়েছেন নানা ভাবে। ভোটের পরে নয়া ফরমান— বিজয় মিছিল করা যাবে না। সন্দেশখালিতে দুটি মৃত যুবকের দেহ লোপাট করার চেষ্টা করেছে

পুলিশ। শেষ পর্যন্ত বিজেপি নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে মৃতদের পরিজনরা দেহ সৎকার করতে পেরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কোনও বিবৃতি দেননি। তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে হিন্দু ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে একচেটিয়া ছাপ্পা ভোটে জিতেছেন— এই ধ্রুব সত্যটা মানুষ দেখেছে চোখের সামনে। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাঁর যাবতীয় দুর্নীতি এবং পাশাপাশি সংসদ অধিবেশনে অপদার্থ ভূমিকা গোটা ভারতবর্ষের মানুষ 'উপভোগ' করেছেন থুতু ফেলে। অথচ সেই ভাইপোকে আগের চেয়ে বেশি করে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন মঞ্চ থেকে মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন— তিনি মুসলমানদের তোষণ করেন। বলছেন, 'যে গোরু দুধ দেয়, সেই গোরুর লাথিও খেতে হয়।' অর্থাৎ ভোট পাচ্ছেন সংখ্যালঘুদের। তারা অপমান করলে, তিনি অপমানিত হতেও রাজি।

কী চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী? গৃহযুদ্ধ?

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ এখন গৃহযুদ্ধের পথেই হাঁটছে বলে মনে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতিগতি এবং হাবভাব পরিষ্কার— বিজেপি বিরোধিতার নাম করে তিনি এখন শুধু হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকেই তীব্র করে তুলছেন না, গোটা বঙ্গকে রাজনৈতিকভাবে বিভাজন করে এক ধ্বংসাত্মক খেলা খেলছেন। গোটা রাজ্যে আগুন জ্বেলে দাবানল সৃষ্টি করতে চাইছেন। তিনি বুঝে গেছেন— এ রাজ্যে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি বুঝে গেছেন— তৃণমূল কংগ্রেস নামক যে দলটির তিনি জন্ম দিয়েছিলেন সেটি অচিরেই শ্মশানযাত্রা করবে নয়তো দলের বিচক্ষণ নেতৃত্বের করায়ত্ত হবে। এমতাবস্থায়, তাঁর লক্ষ্য একটাই— বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হবার আগে সোনার লঙ্কাকে ছারখার করে দেওয়া এবং একটি ধ্বংসস্তূপ বিজেপি নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া। কেন্দ্র তথা মোদী বিরোধিতাকে চরমে নিয়ে যেতে তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে গেলেন না। রাজ্যের কোনো বক্তব্যই কেন্দ্রের কানে তোলা গেল না। কোনও দাবি করা হলো না।

আসলে মমতা ঢুকে গেছেন এক অন্ধ কানাগলিতে। যেটা কৃষ্ণগহ্বরের মতোই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের জগৎ। দলের ল্যাম্পপোস্ট হিসেবে চিহ্নিত অন্য নেতারাও বুঝতে পারছেন— মমতা শুধু রাজ্যস্তরেই গৃহযুদ্ধের সূচনা করছেন না, নিজের তৈরি দলটাকেও টুকরো টুকরো করে ফেলার পথে এগোচ্ছেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়দের মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদরা জানেন, ওই কানাগলি থেকে বেরোবার পথ কোনটা। কিন্তু কথা শুনবে কে? মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যে সবজান্তা ভুঁইফোঁড়। অতএব কালবোশেখির ঝড় তোলার আগে থমথমে আবহাওয়ার মতো নির্বাক হয়ে আছেন ওই সব নেতৃবর্গ। এমনকী রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, পশ্চিমবঙ্গ হাঁটছে এক চরম পরিণতির দিকে যা কালি মাখাবে তাঁর মতো দক্ষ এক প্রশাসনিক কর্তার মুখেও। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে অতি দ্রুত প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, বাঙ্গালি। দায় একজনেরই— তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক ভয়াবহ অভিশাপ তিনি কেউটের মতো মারণ ছোবল দিতে প্রস্তুত। বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালিকে নিয়ে এত ব্যঙ্গ, সোশ্যাল মিডিয়ায় এত ট্রোল হতে দেখা গিয়েছে কখনও? কখনও দেখেছেন কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গের তীব্রতায় টয়লেট সংস্কৃতিতে নামিয়ে আনা হয়েছে? দেউলিয়া হয়ে গেছেন মমতা। দেউলিয়া হয়ে গেছে বাঙ্গলা। বাঙ্গালিকেও যাতে দেউলিয়া হতে না হয়, তাই বিজেপি-র হাত ধরে বাঁচতে চাইছে বাঙ্গালি। রেহাই পেতে চাইছে নিজেদের কৃতকর্মের পাপভোগ থেকে। কারণ এই বাঙ্গালিই তো ভালোবেসে ক্ষমতায় এনেছিল 'সততার প্রতিমূর্তি'-কে!

সারা রাজ্যে নজরানা নেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজার হাজার ভাই-ভাইপোদের পুলিশও আর প্রোটেকশন দেবে না। এখন গৃহযুদ্ধের শিকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর মা-বোন-ভাইদেরও মুখোমুখি হতে চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী। কারণ তাঁরাই প্রশ্ন তুলছেন— পুলিশের সামনেই বিরোধী পক্ষ বা দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মরতে হলো কেন তাঁদের স্বামী, দাদা বা বাবাকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সম্মান কেড়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের, পুলিশকর্তা অর্ণব ঘোষের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলাবাজির রাজনীতির জন্যই শাসকদলের কর্মীদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে হাতপাতালের শয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন সন্দেশখালির বিডিয়ো কৌশিক ভট্টাচার্য। ইঁটের ঘায়ে পুলিশের মাথা ফাটছে, লাঠির ঘায়ে মহিলা পুলিশের পা ভাঙছে। ফলত, সারা রাজ্যে নজরানা নেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজার হাজার ভাই-ভাইপোদের পুলিশও আর প্রোটেকশন দেবে না। এখন গৃহযুদ্ধের শিকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর মা-বোন-ভাইদেরও মুখোমুখি হতে চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী। কারণ তাঁরাই প্রশ্ন তুলছেন— পুলিশের সামনেই বিরোধী পক্ষ বা দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মরতে হলো কেন তাঁদের স্বামী, দাদা বা বাবাকে।

মমতার ব্র্যান্ড ইমেজ ফিনিশ। চারশো কোটি, হ্যাঁ চারশো কোটি টাকা নজরানা নিয়ে প্রশান্ত কিশোর এক বোধহীন অস্থির মস্তিষ্কের অসভ্যতাকে কোন ফেভি-কুইক দিয়ে জুড়বেন? পচে গেছেন মমতা। গোটা শরীরে গ্যাংগ্রিন। কত আর ছাঁটবেন প্রশান্ত? গোটাটাই ফেলে দিতে হবে ভাগাড়ে।

বাঙ্গলার মানুষ হাত ধরবে নতুন বিকল্প এবং একমাত্র বিকল্প— বিজেপির। এটাই সত্য। এটাই বাস্তব। এটাই ভবিতব্য। প্রশান্ত ভূষণও বুঝে যাবেন শীঘ্রই।

মমতা আদতে একজন নৈরাজ্যবাদী

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চরিত্রটি কী? এ প্রশ্ন এখন এই কারণেই উঠতে বাধ্য। কেননা, তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আট বছরের মাথায় রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির যে সার্বিক অবনতি হয়েছে, সেই সূত্র ধরেই। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার এক এক রকম রাজনৈতিক চরিত্র থাকে। চরিত্রগতভাবে কেউ উদারনৈতিক, পরমতসহিষ্ণু। কেউ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। কারো বা প্রখর দূরদৃষ্টি রয়েছে। কেউ ব্যক্তিত্ববান। কেউ বা দুর্বল চিত্ত। ভারতের রাজনীতিতে এইরকম বিভিন্ন চরিত্রের রাজনীতিকদের বারংবার দেখা মিলেছে। দেখা মিলছেও। রাজ্যের রাজনীতিতেও এরকম নানাবিধ চরিত্রের সমাহার দেখেছি আমরা। একজন রাজনৈতিক নেতা যখন অধিষ্ঠিত হন, তখন তার রাজনৈতিক চরিত্রটি কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করে রাজ্য পরিচালনায়, দল পরিচালনায়। ড. প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সিদ্ধার্থশংকর রায়, জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য— একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন এঁদের রাজনৈতিক চরিত্রটি কোনো না কোনো ভাবে এদের প্রশাসন পরিচালনায় এবং দল পরিচালনায় ছাপ ফেলেছে। তেমনভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চরিত্রটিও তাঁর প্রশাসন এবং পরিচালনায় ছাপ ফেলেছে। কাজেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চরিত্রটি যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে শাসন ক্ষমতার মাত্র আট বছরেই সর্বত্র এই মাৎস্যন্যায় পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস দলটির কোনো মহৎ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা রাজনৈতিক কর্মসূচি আছে— এমনটা কেউই বলবেন না। বিরোধী থাকার সময় তাঁর একটিই মাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল। তা হলো— সিপিএম বিরোধিতা। শাসক হিসেবে তার বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি— বিরোধী নিধন। এর বাইরে তার কাছ থেকে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা কর্মসূচির পরিচয় পায়নি দেশের মানুষ। এছাড়াও তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই নানাভাবে অসম্ভব রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সা তার ভিতর প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখলে ব্যর্থ হয়েই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসটি গঠন করেন। এবং গঠন করার মুহূর্ত থেকেই এই দলটির ভিতরে সবরকম গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে এটিকে তার স্বেচ্ছাচারিতায় চলা একটি সংগঠনে রূপান্তরিত করেন। এই দলটিতে তার সমকক্ষ কেউ হয়ে উঠুন তা তিনি কখনই চাননি। যে কারণে, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মুকুল রায় প্রমুখ বহু নেতাই বিভিন্ন সময়ে অপমানিত হয়েছেন তার কাছে। এর ভিতরে মুকুল রায়ের মতো কোনো কোনো নেতা তার সংশ্রব ত্যাগ করে দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু সুব্রত মুখোপাধ্যায় বা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো কোনো কোনো নেতা তা পারেননি। তারা সমস্ত অপমান সহ্য করেই এই দলটিতে রয়ে গেছেন। বিরোধী নেত্রী থাকাকালীনই নিজের দল পরিচালনায় যার ভিতর স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্র তিনি যে নখ দাঁত বের করা স্বৈরাচারী শাসক হয়ে উঠবেন— এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। কার্যত তিনি তাই হয়েছেনও। প্রথমাবধি মানসিকতার স্বৈরাচারী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে এই পর্যন্ত রাজনৈতিক আচরণ যদি ব্যাখ্যা করেন, তাহলে দেখবেন সেখানে ধ্বংসাত্মক এক ভূমিকাই প্রাধান্য পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম রাজনৈতিক প্রচারের আলোয় আসেন সত্তর দশকের মাঝামাঝি। তখন তিনি ছাত্র পরিষদের এক উঠতি কর্মী। ওই সময়ই কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলের সামনে জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির বনেটে উঠে নাচানাচি করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। ওই আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল তিনি প্রকৃত অর্থে সুশিক্ষিত কোনো রাজনৈতিক কর্মী নন। তিনি নিতান্তই একজন স্ট্রিট ফাইটার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢিল ছোঁড়া ব্যতীত যাঁর আর কোনো রাজনৈতিক গুরুত্বই নেই। বস্তুত তার তখনকার রাজনৈতিক দল কংগ্রেসও তাকে স্ট্রিট ফাইটার ব্যতীত অন্য কোনো গুরুত্ব দিত না। ১৯৮৪ সালে প্রবল ইন্দিরা হাওয়ায় যাদবপুর কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে রাজনৈতিক আঙিনায় নিজেকে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন মমতা।

১৯৮৪ থেকে ২০১১— এই সময়কালটুকু ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিপিএম বিরোধিতার যুগ। এই সিপিএম বিরোধী আন্দোলনেই বারবার মমতার রাজনীতির নঞর্থক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এই পর্যায়ের সব আন্দোলন যে সব সময় যুক্তিপূর্ণ হয়েছে— তাও বলা যাবে না। বরং, অনেক আন্দোলনকেই তিনি ধ্বংসাত্মক রূপ দিয়েছেন, তার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে। যেমন একুশে জুলাইয়ের আন্দোলন। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। এবং সেই অভিযান থেকে বিনা প্ররোচনায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা মদন মিত্রের নেতৃত্বে একদল যুব কংগ্রেস কর্মী আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পরিণতিতে পুলিশ

গুলি চালায়। তার রাজনৈতিক ফায়দাটি লুটে নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমনই, নিছকই প্রচারের আলোয় থাকার উদ্দেশ্যে ফেলানি বসাক নাম্নী এক মূক বধির মাহিলাকে সঙ্গে নিয়ে মহাকরণে ধরনায় বসে পড়ার স্মৃতিও অনেকের মনে রয়েছে এখনও। রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর আর ফেলানি বসাককে মনে রাখেননি মমতা। সিঙ্গুর আন্দোলন পর্বে বিধানসভায় ঢুকে ভাঙচুর চালানোতেও প্রমাণ হয়েছে তার নৈরাজ্যবাদী চরিত্রটি। নিছক নৈরাজ্যবাদই তার রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার বলেই তিনি এই রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র হয়েও বলে উঠতে পারেন, 'আমি গুন্ডা কন্ট্রোল করি।' নৈরাজ্যবাদী বলেই তিনি শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কলকাতার আয়কর দপ্তরে দলীয় কর্মীদের দিয়ে হামলা সংঘটিত করতে পারেন।

এইরকম একজন নৈরাজ্যবাদী যখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন, তখন তার এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মানসিকতারই প্রভাব প্রশাসন এবং দল পরিচালনায় পড়বে— সেটাই স্বাভাবিক। এবং সেই নৈরাজ্যবাদী মানসিকতার প্রতিফলনই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার ছ' মাসের মধ্যে তিনি ভবানীপুর থানায় ছুটে গিয়েছিলেন সমাজবিরোধীদের ছাড়াতে। সমাজবিরোধীদের ছাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী থানায় ছুটে যাওয়া ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি কলকাতার মানুষ। তাঁর ওই আচরণই সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল তিনি আইনের শাসন চান না। আইনের শাসন যে তার না পসন্দ— এরপর যতদিন গিয়েছে, তা তাই প্রকট হয়েছে। রায়গঞ্জে তার দলের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের হাতে কলেজের অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হলে তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি। বরং, 'বাচ্চা ছেলে' বলে তাদের আড়াল করেছেন। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিককে বদলি করে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ন্যায়বিচার দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। তারই শাসন আমলে অবাধ নির্বাচনী সন্ত্রাস এবং তাতে তার প্রত্যক্ষ মদত— প্রমাণ করে চূড়ান্ত দমনপীড়নের পথে পা বাড়াতে তিনি কুণ্ঠিত নন। তার এইসব কর্মকাণ্ড কোনোটাই গঠনমূলক নয়, সদর্থক তো নয়ই।

ফলত, সম্প্রতি নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে যা ঘটছে— তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। গত আট বছর ধরে তিনি এইসব কাজেই ইন্ধন

মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন এই রাজ্যটিকে সম্পূর্ণভাবে নৈরাজ্যের অন্ধকারে ঠেলে দিতে। যাতে, কেন্দ্র বাধ্য হয় এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে। আর একবার যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় রাজ্যে, তাহলে শহিদ সেজে ঘোলা জলে আবার মাছ ধরতে নেমে পড়বেন তিনি।

জুগিয়েছেন— তারই বিষময় রূপ এবার প্রকাশ পাচ্ছে। সম্প্রতি রেড রোডে ইদের নামাজে উপস্থিত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। তারপরই বসিরহাটের ঘটনা ঘটেছে। বসিরহাটের ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে কেউ যদি দায়ী থেকে থাকেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাটের ঘটনায় যে মূল অভিযুক্ত সেই তৃণমূল নেতা শেখ সাজাহানকে তিনি গ্রেপ্তার করাননি। বরং শোনা যাচ্ছে, তাকে নিরাপদে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে পুলিশই। বোঝাই যায়, হামলাটি কার প্রশ্রয়ে, কার উস্কানিতে করা এবং কার রাজনৈতিক পরিকল্পনা মাফিক এই হামলার ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। বসিরহাটের ঘটনা মিটতে না মিটতেই এন আর এস হাসপাতালে ডাক্তারদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর কোনো সদর্থক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়নি। অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার বদলে আন্দোলনরত ডাক্তারদের হুমকি দিয়েছেন তিনি। তাদের 'বহিরাগত' তকমা দিয়েছেন। 'ডাক্তাররা বেছে বেছে শুধু হিন্দুদেরই চিকিৎসা করেন'--- এরকম অবমাননাসূচক উস্কানিমূলক কথাবার্তাও বলেছেন। ফলে, পরিস্থিতি আর জটিল হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, সমস্যার সমাধান নয়, বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেওয়াটাই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য।

আর একটি ঘৃণ্য এবং প্ররোচনামূলক রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রেড রোডে ইদের জমায়েত ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ধর্মীয় বিভাজন করেছেন। স্পষ্টতই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উস্কে দিয়েছেন ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভাজনের রাজনীতিটিও করতে নেমেছেন নির্বাচনের পরে। প্রকাশ্যেই বলেছেন, 'আমাদের খাবে, আমাদের পরবে, আবার আমাদের বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন।' এ ধরনের বক্তব্য কার্যত দেশের অখণ্ডতা এবং ঐক্যের বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিভাজনের রাজনীতির পরিণতি যে পশ্চিমবঙ্গে বিষময় হতে বসেছে— এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী এই আচরণ করছেন কেন? একটু তলিয়ে দেখলেই বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই নৈরাজ্য সৃষ্টির পিছনেও একটি রাজনৈতিক অপচেষ্টা আছে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন এই রাজ্যটিকে সম্পূর্ণভাবে নৈরাজ্যের অন্ধকারে ঠেলে দিতে। যাতে, কেন্দ্র বাধ্য হয় এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে। আর একবার যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় রাজ্যে, তাহলে শহিদ সেজে ঘোলা জলে আবার মাছ ধরতে নেমে পড়বেন তিনি। মজার ব্যাপার হলো, তার এই নোংরা রাজনৈতিক চালটি বিজেপি ধরে ফেলেছে। কাজেই বিজেপি এই রাজ্যে কখনই ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছে না। বিজেপি জানে, জনরোষেই মমতার পতন হবে। ৩৫৬ ধারার প্রয়োজন হবে না। আর মমতা যেটা জানেন না, তা হলো— শেষের সে দিন ভয়ংকর।

পশ্চিমবঙ্গ ‘সম্প্রীতির’ আগ্নেয়গিরি

মুসলমান দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত গ্রামবাসী।

অভিমন্যু গুহ

সন্দেশখালির নামটা গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এক নিমেষে জেনে গেছেন। গুলি, বোমা, মারপিট, খুন-জখম— পরিস্থিতি যে ভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে, যাকে অনেক বিশেষজ্ঞ ‘ভোট পরবর্তী হিংসা’ বলে মনে করছেন, তাতে সন্দেশখালি রাতারাতি নামকরা জায়গা হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই উদ্বেগের প্রকৃত কারণটা ঠিক কী, সেটা বোঝার সময় এসেছে। স্বাধীনতার অনেক দিন পর, বিশেষ করে একুশ শতকের রাজনীতি অনেকখানিই পরিচ্ছন্ন হয়েছে। এতকাল যাদের গো-বলয় বলে ব্যঙ্গ করে আসা হয়েছে, সেই হিন্দিভাষী এলাকা, এখনও নির্লজ্জের মতো যাদের গুটকাখোর বলে চিহ্নিত করছে পাকি-দালাল তথা ‘বাঙ্গালি’ তকমাধারী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, তাদের রাজনীতি অনেক পরিশীলিত হয়েছে। লালু-মুলায়মদের দাপটে যে জঙ্গলরাজ চলতো, এমনকী একুশ শতকের গোড়াতেও সেখান থেকে বিহার-উত্তরপ্রদেশ এখন মুক্ত।

এর কৃতিত্ব অটলবিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ সরকারের অবশ্যই প্রাপ্য। গোটা দেশের ছবিটাই এখন পাল্টেছে, ভারতবর্ষ এখনও স্বর্গের সেই দেশ হয়নি, যেখানে খুনোখুনি-জখম-হিংসা থাকবে না, কিন্তু মুড়ি-মুড়কির মতো নরহত্যা, হত্যালীলা দেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো পশ্চিমবঙ্গ। সৌজন্যে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। বাম আমলে মানুষের লাশ পুঁতে দেওয়া হতো, কিছুদিন আগের সুশান্ত ঘোষের নরকঙ্কাল কাণ্ড সকলেরই মনে আছে। তাই খুনের প্রকৃত হিসেবটা চৌত্রিশ বছরের করা যায়নি। তৃণমূলের এসব পোঁতাপুঁতিতে মাথাব্যথা নেই। জার্সি বদলের বিষয়টা এতদূর গড়িয়েছে যে তৃণমূল মারছে তৃণমূলকেই। আর যে বিরোধীরা তৃণমূলি সন্ত্রাসের কাছে মাথা নোয়ানি, অন্তিম সমাধানটা তৃণমূলি দুষ্কৃতীরাই করে দিয়েছে আক্ষরিক অর্থে এই মাথা না নোয়ানোদের মাথা কেটে। পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই আজব রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছে। সরকারি অপশাসন সত্ত্বেও রাজ্যে পালাবদল ঘটে না দীর্ঘদিন ধরে, এমনই অভিযোগে। এই অভিযোগ মিথ্যে নয়, বামেদের চৌত্রিশ বছরের শাসনেই তা দেখা গেছে। অন্যদিকে তৃণমূলের ৮ বছরে। এ বছর লোকসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূলকে বাঙ্গলা ছাড়া করার অনবদ্য উদ্যম দেখা গেছে, ভোটের আগে এসব নেহাতই কষ্টকল্পনা ছিল।

দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষায় কোথাও পালাবদলের পালা এলে, রাজনৈতিক সংঘর্ষের মাত্রা বাড়ে এটা জানার জন্য রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে তাই রাজনৈতিক হানাহানি বাড়বে, এটা কাম্য না হলেও স্বাভাবিক। এর জন্য কেন্দ্র বিশেষ নজর দিতেই পারে, কিন্তু যেভাবে তাদের উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, যেভাবে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠেছে তাতে পরিস্থিতি যে বেশ ভয়াবহ তা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কেন এই ভয়াবহতা? কারণ উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে, তা মোটেও রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়। একটি এগিয়ে থাকা, এগিয়ে রাখা (ওটা সম্ভবত পেছনের দিক দিয়ে) বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম তো বিষয়টিকে আবার ‘মাছের ভেড়ি নিয়ে সংঘর্ষ’ ইত্যাদি বলে নজর ঘোরানোর পুরো ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

বামফ্রন্ট জমানায় আমরা একটি মহৎ শিক্ষা পেয়েছিলাম— ‘সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না’। এই ‘ধর্মহীন সন্ত্রাস’ পশ্চিমবঙ্গকে কাশ্মীরের থেকেও ভয়ংকর জায়গায় নিয়ে গেছে বাম ও তৃণমূল আমলে। কাশ্মীরি পণ্ডিত আর পশ্চিমবঙ্গের মূলনিবাসী হিন্দুর মধ্যে এই মুহূর্তে কোনও তফাত নেই। দু’জনেই নিজভূমে পরবাসী। বাম আমলে রাজ্যে যথেচ্ছ অনুপ্রবেশ হয়েছে, সীমান্ত লাগোয়া এলাকায়; বামফ্রন্ট তাদের সমাদর করে ডেকে আনার পরিবর্তে নিজেদের স্থায়ী ‘ভোটব্যাঙ্ক’ গড়তে চেয়েছিল। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা তার প্রতিদান দিয়েছিল স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দুদের বাস্তুচ্যুত করে। পরিণামে মালদা-মুর্শিদাবাদ সমেত সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে ‘তেনারা’ ফুলে-ফেঁপে ওঠেন। বামফ্রন্টের তরী ডুবতে, তৃণমূলে আশ্রয় নিয়ে ‘যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি সইতে হয়’ নীতিতে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার আরও বাড়ে, পুলিশ প্রশাসনের নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেগঙ্গা, ধুলাগড়, অশোকনগর, সাম্প্রতিক সন্দেশখালি-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িকতার যে নগ্নরূপ দেখেছে, ৪৬-এ নোয়াখালির পৈশাচিকতার সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে। সন্দেশখালির সৌভাগ্য ঘটনাটা তবু সংবাদমাধ্যমে এসেছে। নচেৎ দেগঙ্গা, ধুলাগড়, অশোকনগর— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মহান কর্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম ন্যূনতম গাফিলতি দেখায়নি, অতিথি-পড়শিদের হাতে এ রাজ্যের হিন্দুদের মার খাওয়াকে তারা অতিথি সৎকারের অঙ্গ বলেই মনে করেছিল। শাক দিয়ে ক্রমশ মাছ ঢাকা দিতে দিতে শাক যে

ফুরোচ্ছে তা তাদের খেয়াল ছিল না; এখন আঁশটে গন্ধে টেঁকা দায়।

তবু তারই মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অবশ্য পালনীয় কর্তব্যে হিন্দুদের আরও উদার হতে ডাক দিয়েছেন বামপন্থী তৃণমূলি বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু এলাকাবাসীরা বিপদটা বুঝছেন হাড়ে হাড়ে। এই ঔদার্যের ক্ষতটা কতটা গভীর তাঁরা তা জানেন। কারণ নিজেদের চোখে তাঁরা দেখেছেন সন্দেশখালির সরবেড়িয়া অঞ্চল কীভাবে রোহিঙ্গাদের গ্রাসে চলে গিয়েছে। এখানকার মানুষের খেয়ে পরে এখানকার মানুষেরই দাড়ি ওপড়ানোর ব্যবস্থা মমতা প্রশাসন কীভাবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে করে দেখিয়েছেন তা এলাকার মানুষ জানেন। আর আমরা জানি, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া, খেতে-পরতে দেওয়া, মায় বঙ্গবাসীর সর্বনাশ করতে দেওয়ার দাবিতে বুদ্ধিজীবীরা সমস্বরে রাস্তায় নেমেছিলেন। সন্দেশখালির ঘটনার পর অবশ্য এ রাজ্যের মানুষ এঁদের অনেক খুঁজেছেন, 'আনন্দে' কিংবা অন্যত্র যদিও বিফল হয়ে শেষে 'হারানো, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ'-এ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এই রোহিঙ্গাদের নিয়ে শেখ সাজাহান বলে একটি 'মহাত্মা' এলাকায় যেভাবে মুঘল-শাসন জারি করেছিলেন, তাতে জিজিয়া কর দিয়েও হিন্দুদের রেহাই মিলছিল না। আশপাশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত পাল্টাচ্ছে, তাতে সন্দেশখালিকে সেই ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে কাদের মোল্লা, জিয়াউদ্দিনের মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী থুড়ি তার উজির-আমলাদের দিয়ে প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডলদের খুন করিয়ে দেয়। নিখোঁজ হয় দেবদাস মণ্ডল। দেবদাসের ভাই নিমাই ছিল একনিষ্ঠ তৃণমূল-সমর্থক। মমতাকে নিয়ে গান বেঁধেছিল 'ধন্য আমার বঙ্গমাতা, প্রণাম করি পায়ে।' নিমাইয়ের আশঙ্কা মুসলমানরা তাঁর দাদাকে খুনই করেছে। হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন, দুষ্কৃতকারীদের এলাকার লোক তৃণমূল কিংবা সিপিএম বলে আর গেরাহ্যির মধ্যেই আনছে না। কারণ এই শেখ সাজাহান এককালে দাপুটে সিপিএম নেতা ছিল, এখন তৃণমূলে। সন্দেশখালিবাসী জানেন সাজাহানের মতো লোকেরা ক্ষমতার সঙ্গেই থাকে, আর কচুকাটা হওয়াটা তাদের ভাগ্যেই জোটে। কারণ সাজাহানরা ভোটব্যাঙ্ক গড়তে জানে, প্রকৃত সন্দেশখালি- বাসিন্দারা এতদিনেও সেই ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁরাই বলেছেন, রোহিঙ্গাদের দিয়ে এলাকার হিন্দুদের এলাকা-ছাড়া করার পরিকল্পনা সাজাহানের ছিল। বাংলাদেশের জামাতিদের নিরাপদ

নিহত সুকান্ত মণ্ডলের পরিবার।

আশ্রয়েই আপাতত এই সার্থকনামা মুঘল সম্রাটের দিন অতিবাহিত হচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন।

দেবদাসের ভাই নিমাইয়ের স্বীকারোক্তি অন্তত এইটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছে এই সংঘর্ষ মামুলি তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'দুধওয়ালা গোরু' তত্ত্বে আজ সেই বিশেষ 'গো-প্রজাতি'টি তৃণমূলের সম্পদ হয়ে উঠেছে, তাই হিন্দুদের ওপর অমানবিক অত্যাচার, যা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক মদত পাচ্ছিল, তা এবার বেআব্রু হয়ে প্রকাশ্যে এসেছে। সারা রাজ্যেই মমতা ব্যানার্জির 'দুধেল গাই' থিয়োরি তাঁর এতদিন সযত্নে ঢেকে রাখা মুখোশের আড়ালের মুখটা প্রকাশ করে দিয়েছে। ফলে একদিক 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' রক্ষা করতে গিয়ে, 'বিজেপি-কে রুখতে তৃণমূলকে ভোট দিন', কিংবা 'বিহারি হঠাও, গুটকাখোর হঠাও, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই— এক ঠাঁই' ইত্যাদি যে স্লোগান মমতাদৃপ্ত বুদ্ধিজীবীরা আমদানি করেছেন, অন্যদিকে মমতা-পদলেহী সংবাদমাধ্যমেও যেভাবে 'সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা'য় ফোঁস ফোঁস করছে, তাতে সম্প্রীতি (পড়ুন হিন্দু নিধন) রক্ষায় এঁদের পুরো চেষ্টাটাই মাঠে মারা যাচ্ছে। আর বামপন্থীদের কথা ছাড়ুন, বেচারিদের দেখলেও কষ্ট! আম-ছালা একসঙ্গে যাবার ব্যথা যে কী দুর্বিসহ, সে কেবল তাঁরাই বুঝবেন। সে যাক, হিন্দুরাও এখন পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শিখেছে তাই কাইয়ুম মোল্লা বলে একজন মারা যায়। এর পেছনে তৃণমূলেরই 'হঠাৎ হয়ে যাওয়া' হাতের ছায়া স্থানীয়রা দেখছেন, যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু তারপরও যেভাবে হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করতে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও পুলিশের নাকের ডগায় সাজাহান বাহিনী সশস্ত্র বাইক মিছিল করলো, তা নিন্দনীয়।

বুদ্ধিজীবীদের দৌলতে মমতা প্রশাসনের মাথায় সুবুদ্ধি না থাক, দুর্বুদ্ধি যথেষ্টই আছে। সন্দেশখালির মৃতদের দেহ কলকাতায় এলে তোষণের বীভৎসতার আঁচ এসি ঘরে বসে হিসেব কষা রাজ্যের 'রাজনৈতিক বিশ্লেষক'রা অবশ্যই পেতেন। যাঁদের অনেকে মুসলমান-দলিত ঐক্যের নামে হিন্দু সমাজকে ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একটা খটকা তো থেকেই যাচ্ছে যে ১৯৫১ থেকে আজ পর্যন্ত (২০১৬) সন্দেশখালির সবকটা বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দুরা, যাঁরা তথাকথিত পিছিয়ে পড়া (যেহেতু কেন্দ্রটি এখন তপশিলি তালিকাভুক্ত) তাঁরাই জিতে এসেছেন, অথচ স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুদের ওপরই মুসলমানদের ভয়াবহ অত্যাচার ন্যাজাট-সহ সন্দেশখালির বিভিন্ন অংশ দেখে এসেছে। কিছুদিন আগেও একদা সিপিএম নেতা কান্তি বিশ্বাসের খাসতালুক ছিল এই এলাকা অতঃপর দলিত -মুসলমান ঐক্য ঠিক জমলো কি? সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ধান্দাসর্বস্ব থুড়ি বুদ্ধিসম্পন্ন মানে বুদ্ধি ভাঙানো বুদ্ধিজীবীগণ কী বলেন? ■

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেগঙ্গা, ধুলাগড়, অশোকনগর, সাম্প্রতিক সন্দেশখালি-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িকতার যে নগ্নরূপ দেখেছে, ৪৬-এ নোয়াখালির পৈশাচিকতার সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের বোধোদয় কবে হবে ?

রাজু সরখেল

পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী কবে শুধরোবেন এই প্রশ্ন সর্বস্তরের মানুষের। এক মিডিয়ার সঞ্চালক এক প্রবীণ অভিনেত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কানাইয়াকুমারকে সিপিএম প্রার্থী করেছিল কেন? অভিনেত্রী উত্তর দিলেন, তিনি কানাইয়াকুমারের প্রচণ্ড ফ্যান। সঞ্চালক বললেন, কানাইয়াকুমার তো সর্বাধিক ভোটে হেরে রেকর্ড গড়েছেন। অভিনেত্রী বললেন, কেন হারলো বুঝতে পারলাম না, আসলে ভারতবর্ষ সোনা চেনে না। তাহলে বুঝুন এই সবজান্তা অভিনেত্রীর মানসিকতা! যে কানাইয়া জেএনইউ-তে স্লোগান তোলে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' তিনি তাঁর ফ্যান? এই অভিনেত্রী পশ্চিমবঙ্গের তৃণ বুদ্ধিজীবীদের ব্যানারে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এখন বলছেন, মমতা ব্যানার্জি নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়ছেন। বলতে লজ্জা হয়, এই বুদ্ধিজীবী সমাজ দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন। আজ পর্যন্ত নিজের জমিভিটে বিক্রি করা কিংবা রক্ষা করার মুরদ বা সাহস তাঁদের হলো না। এমনকী পরবর্তীকালে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন সকলকে একে একে নিয়ে এলেন সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে। এরা নিজেদের সেকুলার বলে মিডিয়ায় বারবার তুলে ধরেন। এরা এতো সেকুলার যে অনবরত শুধু হিন্দুদের মারাত্মক সমালোচনা করেন এবং অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের প্রশংসা করেন ও জেহাদিদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে চুপ করে থাকেন। তাদের জন্য এদের প্রাণ কাঁদে।

নিহত পলাশ রায়

একটি মুসলমান কোনো অপরাধে গণপ্রহার খেলে এই বুদ্ধিজীবীরা আদাজল খেয়ে মোমবাতি মিছিল, মৌন মিছিল এবং বড়ো বড়ো ভাষণ দিয়ে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে। কিন্তু হিন্দু মেয়েরা যে প্রতিদিন লাভ জেহাদির শিকার হচ্ছেন, প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছেন, প্রতিদিন এদের জোর করে ধর্মান্তকরণের চাপ দেওয়া হয় কিংবা কোনো না কোনো অজুহাতে মেরে ফেলা হচ্ছে। তখন বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে থাকেন কেন? সম্প্রতি, টুইঙ্কেল শর্মা নামে তিন বছরের একটি শিশুকে দুটি মুসলমান ধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা করল প্রমাণ লোপাটের জন্য। সেই অভিনেত্রী তো একবারও ওই অপরাধীদের ফাঁসির দাবি করলেন না। এরা আসলে সিলেক্টিভ সেকুলার।

এভাবে মুসলমানদের এরাই তোল্লা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। তারা কত লিটার জল ব্যবহার করছেন ও খাবার জন্য চাল, তেল, চিনি, ডাল, আটা, চাল, চিনি, কেরোসিনে এদের জন্য কত ভরতুকি দিতে হচ্ছে তার হিসেব কেউ রাখছেন কি? চাকরিতে সংরক্ষণ, স্কুলে ও কলেজে কোটা, সরকারি অনুদান আর কত কী। জনপ্রতি কত লিটার জল ও কত কিলো আনাজপাতি এদের জন্য বাড়তি উৎপাদন করতে হচ্ছে। এক কোটি অনুপ্রবেশকারীর জন্য খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে দেশবাসীকে বেশি দাম দিয়ে এগুলি কিনতে হচ্ছে। একে তো দ্রব্যমূল্য কমছেই না উপরন্তু বেকারত্ব, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, গোরু চুরি ও পাচার বাড়ছে। তাই এনআরসি-র চিন্তা ভাবনা করেছে কেন্দ্র। এদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলে ভাবুন তো কত সাশ্রয় হবে! একটি ছোট্টো দেশ মায়ানমার বুঝে গেল রোহিঙ্গারা তাদের বিপদ, তাই রাতারাতি তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। প্রতিবেশী চীনে মুসলমানদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আইন আছে, রাস্তা আটকে নামাজ করার ক্ষেত্রে আইন আছে, মাইকে আজান দেবার ক্ষেত্রে শব্দ নিয়ন্ত্রিত আইন লাগু আছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই কোনোকিছু করতে গেলে সেকুলাররা রে রে করে ওঠে। এর কারণ, ভোটব্যাঙ্ক। তোয়াজ এদের করে প্রতিটি দল। হিন্দুদের ঘরে দুটির বেশি সন্তান নয় আর এদের ঘরে ন্যূনতম কুড়ি থেকে পঁচিশ জন। এদের গায়ে আঘাত লাগলে বুদ্ধিজীবীরা সমস্বরে বলেন, এই বাঙ্গলা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বাঙ্গলা, 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'। তাঁরা কি জানেন বাংলাদেশে হিন্দুরা কীভাবে রয়েছেন, কত কষ্টে, কত আতঙ্কে দিনাতিপাত করছেন? আর এপারে মুসলমানদের সংখ্যা কত বেড়েছে, তথ্যটা নেবেন। টিভিতে বসে গালভরা গল্প করা সহজ কিন্তু বাস্তবটা কত কঠিন একটু গ্রামেগঞ্জে ও সীমান্ত এলাকায় ঘুরে দেখে আসুন। এই রাজ্যে হিন্দুরা কি আদৌ সুরক্ষিত?

বাংলাদেশে হিন্দু মহাজোটের নেতা দক্ষ উকিল পলাশ রায়কে জেলেই পুড়িয়ে হত্যা করা হলো, কোথায় বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতি মিছিল? হিন্দু মরলে কোনো সমবেদনা নেই। এই বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতে এসেছেন। আর এখানে সেকুলার সেজে বসে আছেন। এদের বোধোদয় কবে হবে! ■

ALWAYS EXCLUSIVE
NR Vandana ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

চাল কুটতে হলো বেলা

পরম্পরা

চূড়ামণি হাটি

ঢেঁকিশালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তকে ঘিরে 'ঢেঁকি' শব্দটি হয়তো বেঁচে থাকবে কিন্তু 'ঢেঁকি' বস্তুটির স্থায়ী ভাবে স্বর্গবাস নিশ্চিত হয়ে যাবে আর কিছুদিন পরে। পাখির মতো ঠোঁট-লেজ আছে কিন্তু ডানাছাঁটা এ বস্তুটি যে ঘটনাক্রমে নারদের বাহন হয়েছে; হয়তো সে ঘটনাকে আশ্রয় করেই একক ক্ষমতায় উড়ে উড়ে স্বর্গে যাবে। মনে রাখতে হবে, কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কিন্তু মর্ত্যবাসীরা সে ছবি তুলতে পারবে না। ছবি দূরে থাক। কিন্তু চালনা না করলে ঢেঁকি নিজে তো নিষ্কর্মা। কথা তাই আছে বুদ্ধির ঢেঁকি। স্বর্গে গোবর বা আমড়া কাঠের ঢেঁকিও যা; বাবলা কাঠের ঢেঁকিও তাই হয়ে যাবে।

পলকা আমড়া কাঠ দিয়ে ঢেঁকি হয় না। ঢেঁকি হয় মূলত বাবলা কাঠের। এছাড়া বেছে নেওয়া হয় শিরিষ, কাঁঠাল, অর্জুন, তেঁতুল, কুল, শাল, বকুল কাঠ। ঢেঁকির মুখ তৈরিতে গুরুত্ব পায় পেয়ারা কাঠও। ঢেঁকিতে পা দেওয়া হয়; তাই ঢেঁকির শরীর নিম কাঠের হয় না। কারণ হিসাবে স্মরণে আসবে আর এক অবতার নিমাইয়ের জন্ম মুহূর্ত। যাইহোক, খাদ্য উপযোগী হয়ে শস্যদানার জন্ম ঢেঁকির গড়ে। এ স্থানটি স্ত্রী যৌন অঙ্গের প্রতীক হয়ে ধরা দিয়েছে গ্রামীণ সমাজের নানা বাক্য বিনিময়ে। ঢেঁকিশালে মেয়েদেরই ভিড়। গড়ে মাথা গুঁজে থাকা ঢেঁকিকে চালনা করে মেয়েরাই। ভাঙানিরা হাঁটু ভেঙে এক পা ঢেঁকির লেজে রেখে চাপ দিয়ে ঢেঁকির মুখ তুলে রেখে আবার সময়ের তালে তালে রেখে পায়ের চাপ ছাড়া; ক্রমাগত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে গড়ের মুখে থাকা মহিলার নির্দেশের অপেক্ষায়। গড়ের মুখে অভিজ্ঞ মহিলারাই সাঁকাই হন। শস্যদানা ওলট-পালট করেন। সঠিক ছন্দজ্ঞান নিয়েই তিনি গড়ের মুখে হাত ঢোকান। কখনোই হাত বের করে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে না ঢেঁকির মুখ। অসাবধান বা অন্যমনস্ক হলেই হাত যাবে থেঁতলে। পাশাপাশি গড়ের মুখে ছড়িয়ে যাওয়া শস্যদানা নিয়ন্ত্রণের কাজটিও করেন খেজুর পাতার ঝাঁটা নিয়ে। যারা পাড় বা পাত দিচ্ছে তারা শরীরের হ্যালাদোলাকে নিয়ন্ত্রণ করেন বাঁশ বা দড়ি ধরে। একটু বেসামাল হলেই গড়ের মুখে ঘটবে বিপদ। পাশাপাশি বসে থাকা মেয়েরা কেউ কুলো নিয়ে ঢেঁকিতে ভানা ধানের কুঁড়ো উড়ায়। কেউবা চালুনিতে চেলে ঢেঁকিছাঁটা চাল বা চাল গুঁড়ো আরও নিখুঁত করে। ভিজিয়ে রেখে সিদ্ধ করে ধানের মুখ ফাটানো এক সিদ্ধ ভাতের চাল, দুই সিদ্ধ মুড়ির চাল আর সিদ্ধ করে মাটি খোলায় ভেজে নেওয়া ধান ঢেঁকিতে চ্যাপ্টা করে হয় চিঁড়ে। এক্ষেত্রে ঢেঁকির মুখ থেকে লোহাটি খুলে নেওয়া হয়। গায়ে হলুদের হলুদ কোটা হয় ঢেঁকিতে। বিবাহের তিন দিন আগে ঢেঁকিকে ঘিরে ঢেঁকি মঙ্গল নামক আচার বা কিছু সংস্কারগত ক্রিয়া পালন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে ঢেঁকি-সহ লৌকিক প্রযুক্তি নির্ভর নানা কৃষিযন্ত্রে খড়ের গুছির মালা পরানো হয়। ঢেঁকিশালে সন্ধ্যা

প্রদীপ দেওয়ার রীতি তো আছেই। নবান্নের ধান ভানা শুরুই হয় পুজো দিয়ে।

সূত্রধরদের একটি ধারা; যারা মাটিতে কাঠ রেখে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে নির্মীয়মাণ বস্তুটির গঠনশৈলী এঁকে নেন; সেই খড়িপত্যে সূত্রধর মূলত ঢেঁকির নির্মাণকারী। অবশ্য ঢেঁকির মুখের খায় আঁটকাতে কর্মকারদের সাহায্যও নিতে হয়। তৈরি করে দেয় লোহার মুখসালাই বা মুশল। যা খাঁজ কেটে পরাতে হয়। অবশ্য সাধারণ মানের ঢেঁকির রূপ যে-কোনো শ্রমগোষ্ঠীর মানুষই দিয়ে দিতেন এক সময়। হয়তো এ কারণেই ঢেঁকির গতরের উপর এতো নিন্দেবাক্য। অবশ্য ঢেঁকির ভার বহনের মধ্যে বীরত্বের ইঙ্গিত আছে।

একসময় ডাকাত দল ঢেঁকি খুলে নিয়ে পাশের কোনো ঘরের দরজা ভেঙে ডাকাতি পর্যন্ত করেছে। দরজা ভাঙতে বা দরজার হুড়কো ভেঙ্গে দিতে একত্রিত ভাবে ধাক্কা দিতে কাজে লাগিয়েছে ঢেঁকির শক্ত চেহারা। অবশ্য শস্যপেষণের জন্য ঢেঁকির স্থূল-শক্ত চেহারার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তার গঠন। আর ঢেঁকি বসানোর মধ্যেও আছে প্রযুক্তিবিদ্যার দখল। দুটি পায়া না বলে; বলা ভালো দুটি দণ্ডের উপর বসে থাকে ঢেঁকি। যে নড়ে না চড়ে না; তাকে তো আর পা বলা যায় না। দুটি দণ্ডের উপরিভাগ অর্ধচন্দ্রাকৃতির। যার উপর বসানো হয় ঢেঁকির মাঝবরাবর ঢুকিয়ে দেওয়া হুড়কো। কেউ বলে তেসলি। বৃহৎ ঢ্যাঙা-পেট ও লেজের মধ্যবর্তী সীমানাটিতেই ওঠে দু'প্রান্ত দণ্ডের উপর বসানো হুড়কোর ঘুরতে থাকা মৃদু কিঁচ-কিঁচ ধ্বনি। আর মুখের কাছে 'ঢক-ছক' ধ্বনি। এ ধ্বনির ধাক্কা তুলনামূলক ভাবে বেশ বেশি আবার ফিরে যায় জন্মে। জন্ম মুহূর্তে শিশু না কাঁদলে ঢেঁকির আওয়াজ তোলা হতো।

যখন মানুষের কাছে বুনো ঘাসের বীজ খাজ্য হিসেবে গুরুত্ব পেল এবং একই সঙ্গে এও লক্ষ্য করলো একটি বীজ আবার অনেক শস্যদানা নিয়ে তার পুনর্জন্ম হয়। বর্তমান খাদ্যবস্তু এবং ভবিষ্যতের খাদ্যবস্তু জোগানের ভরসা; এই দুই আবিষ্কার মানুষকে শিকারী জীবন থেকে কৃষিজীবনে সহজে বাঁচার উপায় বুঝিয়ে দিলো। সহজকে অতি সহজ করার লক্ষ্য নিয়ে মানুষ উপায় এবং পুনঃ উপায় খুঁজে বেড়িয়েছে। অভিজ্ঞতার জোরে এই পুনঃ পুনঃ উপায়ের সন্ধান করতে গিয়েই মানুষ পাথরের খোঁচা থেকে লাঙ্গলের ফালের খোঁচা মারতে পেরেছে। পাথর বা গাছের গুঁড়ির গায়ে শস্য পেষাই করতে করতেই পাথরের জাঁতাকল এবং কাঠ বা বাঁশের উদুখল আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি চক্রাকার পাথরখণ্ডের মধ্যস্থলে একটু বেশি ছিদ্র করে ওই ছিদ্রে একটি কাঠের শক্ত কাঠি ঢোকানো হয় এবং যাতে কাঠি না নড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই কাঠি লাগানো পাথর খণ্ডের উপর বসানো হয় মধ্যস্থলে পূর্ণ ছিদ্র করা আর একটি গোলাকার তুলনামূলক পাতলা পাথর। এ কাঠির উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে ঘোরানোর জন্য ধারে আর একটি কাঠি ঢোকানোর মতো ছিদ্র করা হয়। এ পাথরে পিঠে আর একটি ছিদ্র রাখা হয় তিল বা ডাল জাতীয় শস্যদানা দেওয়ার জন্য। শস্যের খোসা ছাড়াতেই এর ব্যবহার। তিলের কথা যখন এলো স্মরণে আসে ঘানির কথাও। যাইহোক ঢেঁকির আঘাতের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে উদুখলের উপর মানুষের কঠিন পরিশ্রমটি বেশি স্মরণে আসে।

মূলত কাঁঠাল কাঠের কিংবা কাঁচা বাঁশের কিছুটা বাঁশ সহ গোড়ার অংশটি এ কাজে লাগানো হয়। বাঁশের ভেতরের ফাঁকা অংশে শস্যদানা রেখে একটি লম্বা পেষণ দণ্ড দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হয়। হামান দিস্তার মতো। হামান দিস্তা অবশ্য রান্নার মশলা বাটতে শিল-নড়ার বিকল্প। বলাবাহুল্য, অনেক সময় অকেজো শিল স্থান পেতো ঢেঁকির গড়ে। তা না হলে ঝামা পাথর। কাঠের হলে তো খুব ভালো।

মনে রাখতে হবে, ঢেঁকির গড়ের থেকে আরও গভীরে থাকে ঢেঁকির পায়া জোড়া বা দুটি দণ্ড। ঢেঁকি সোজা কিংবা ঈষৎ বাঁকা। সামনের অংশ পেছন অপেক্ষা সরু। পা রাখার জন্য ঢেঁকির লেজ চওড়া। এক পা ঢেঁকির লেজে আর অন্য পাটি রাখতে লাগোয়া মাটির ঢিবির প্রয়োজন পড়ে না; যদি মাপ-বল-ভরের সঠিক হিসেব রেখে লেজের দিক একটু কোণ করে ঢাল রাখা হয়। অনেক আগে এমনটিই হতো। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের বীরভূম গণপুরের শিবমন্দিরটিতে স্থাপন করা একটি পোড়ামাটির ফলক এ ইঙ্গিতই দেয়। ঢেঁকি বৃহৎ বাঙ্গলার নিজস্ব লৌকিক প্রযুক্তি। যদিও উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণেই এর ব্যবহার বেশি। প্রায় ঘরে ঘরে ছিল ঢেঁকি।

বাঁকুড়া-বর্ধমানের কয়েক ঘরে এখনো এর দেখা মেলে। বৈঠকখানার পেছনে; খামার কিংবা রান্নাঘর সংলগ্ন স্থানে ঢেঁকির জন্য ঘর নির্দিষ্ট হলেও সে ঘরে দরজা থাকতো না। যেন ঢেঁকিশালে যাওয়ায় কোনো বাধা নেই। এক সময় পটুয়া চিত্রকর গইনরাও যমালয়ের দৃশ্য দেখিয়ে বলেছেন, ঢেঁকি ব্যবহারে কাউকে বাধা দিলে যমালয়ে তার মাথায় ঢেঁকি দিয়ে আঘাত দেওয়া হবে। হয়তো এমনই কোনো এক কারণে ভিটে মাটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকি স্থান পরিবর্তন করে না। ঢেঁকির স্থান উঠোনেও হয়। এখন আর কেউ ঢেঁকির ধার ধারে না। ঢেঁকি কোলে মরাই বাঁধারও প্রয়োজন পড়ে না। হারিয়ে গেছে 'চাল কুটতে হলো বেলা' এমন ছড়া নির্ভর খেলাগুলি। খেলার ছলে শুধু ঢেঁকি চড়ে বসা নয়! খেলায় দেহভঙ্গীতে ঢেঁকির ওঠা-নামাকে নকল করেছে শিশু বয়স। আজ এসব দৃশ্য হারিয়ে গেছে।

আর কিছু দিন পর জন্ম নেওয়া শিশুর ভাগ্যে ঢেঁকির ওঠা-নামা দেখা হবে না। গোরুর গাড়িতে ধান আনা, ঢালু করে কাঠের পাটা রেখে ধান ঝাড়া, গোরু বেঁধে কুঁটি মারা, ঢেঁকি ছাঁটা কালচে বাদামি চাল এসব গ্রামীণ দৃশ্যের টুকরো ছবি একের পর এক হারিয়ে যেতে বসেছে। অনেক আগেই এসেছে উন্নত প্রযুক্তির ধান-কল অর্থে হাস্কিং মেশিন। বর্তমানে এখানে ওখানে গজিয়ে ওঠা মিল এবং আটা-গুঁড়ির কল।

বাড়ির কর্তারা চাল গুঁড়ো করতে ছুটে যাচ্ছে মেশিনের কাছে। উঠে যাচ্ছে ঠিকই; তবুও বলি কোনো কোনো গিন্নি একটু দূরে হলেও ছুটে যাচ্ছে ঢেঁকির কাছে। কিন্তু বেশিরভাগ পাড়াতেই ঢেঁকি নেই তো ছুটবে কোথায়! ঢেঁকির কচ্‌কচানি প্রায় সব পাড়াতেই বন্ধ। ▮

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন

স্বপন কুমার দাশগুপ্ত

সাঁওতাল বিদ্রোহ সাধারণভাবে সাঁওতাল হুল নামে পরিচিত ছিল। বস্তুত এটি একটি প্রাদেশিক বিদ্রোহ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এবং তৎকালীন জমিদারি পদ্ধতির বিরুদ্ধে পূর্বভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে সাঁওতালরা এই আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। এই বিদ্রোহ ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন শুরু হয়। ওই বছরের ১০ নভেম্বর ব্রিটিশরাজ সাময়িক আইন জারি করে যা ১৮৫৬ সালের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। সামরিক আইন স্থগিত হবার পর ব্রিটিশশাসকের অনুগত সেনাবাহিনী এই বিদ্রোহ অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল চার ভাই— সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব।

এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশদের অনৈতিক উপজাতীয় ব্যবস্থা, সুদখোর মহাজন, তৎকালীন ভারতের জমিদারি ব্যবস্থা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাঁওতালদের একটি প্রতিক্রিয়া। এই বিদ্রোহ স্থানীয় জমিদার, পুলিশ, ব্রিটিশ আইন দ্বারা বিকৃত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিল।

ভারতে ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে সাঁওতাল বা পাহাড়ি জেলার অধিবাসীদের মালভূম, বাবাভূম, ছোটোনাগপুর, পালামৌ, বীরভূম জেলায় বসবাস ছিল। তাদের জীবনযাপন ছিল অরণ্য নির্ভর। তারা জঙ্গলের ছোটো ছোটো অঞ্চল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে, শিকার করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এগুলি ছাড়া তাদের জীবনধারনের আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকের প্রতিনিধিরা বনবাসীদের অধিকারভুক্ত জঙ্গল অধিকার দাবি করলে সাঁওতালরা রাজমহল পাহাড়ে চলে যায়। কিছুকাল পরে ইংরেজরা স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় রাজমহলের

জঙ্গলের উপরেও তাদের অধিকার দাবি করে। জমিদার ও মহাজনেরা ঋণ দিয়ে সাঁওতালদের বিভিন্ন জিনিস বন্ধক নিতে শুরু করল। অসৎ উপায়ে সে ঋণের পরিমাণ সুদে আসলে এত দাবি করে যে শোধ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তারা জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর বেগার শ্রমিকে পরিণত হলো। আসলে বনবাসীদের সরলতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করা হচ্ছিল। এই অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৮৫৫ সালে সিধু ও কানু মুর্মু ২০ হাজার সাঁওতালকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা চালু করে। এই সংগ্রামের জন্য তারা তাদের নিজস্ব আইন তৈরি করে কর সংগ্রহ শুরু করে। কিছুকালের মধ্যে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং অনেক অত্যাচারী জমিদার, মহাজন এবং তাদের অনুগত কর্মীদের মৃত্যুদণ্ড নেওয়া হয়।

বিদ্রোহ দমনের জন্য স্থানীয় জমিদার এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের সহায়তায় ব্রিটিশ শাসক বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠায়। সিধু ও কানুকে গ্রেপ্তার করার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

এই অসমযুদ্ধে বেশ কিছু সাঁওতাল হতাহত হয়। সাঁওতালদের তির-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিশ সেনাদের আধুনিক বন্দুক, কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করার অনুপযুক্ত ছিল। ১৮৫৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কাহারগাঁও, সুবি, রঘুনাথপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বড়োবড়ো সংঘর্ষ ঘটে। এই বিদ্রোহ অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। সিধু ও কানুকে হত্যা করা হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব যুদ্ধের জন্য যে হাতি পাঠিয়েছিল সেগুলি সাঁওতালদের কুটির ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও মিত্রশক্তি ব্যাপক ধরপাকড় ও নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল। এই যুদ্ধে জড়িত ৬০ হাজার উপজাতিদের মধ্যে ১৫ হাজারের বেশি নিহত হয়েছিল এবং ১০টি গ্রাম ধ্বংস হয়েছিল। সাঁওতালরা কেবলমাত্র গোয়ালা ও লোহার শ্রেণীর সাহায্য পেয়েছিল।

এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। সাঁওতালদের অস্মিতা ও অস্তিত্বের লড়াই পরবর্তী বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন 'মৃগয়া' ছায়াছবিটি নির্মাণ করেন। এই বিদ্রোহকে স্মরণ করে আজও সাঁওতালরা হুল দিবস পালন করে।

হুল দিবসে বনবাসী সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবদের অবদানকে স্মরণ করে। ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের ২ বছর আগে ১৮৫৫ সালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে এই সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

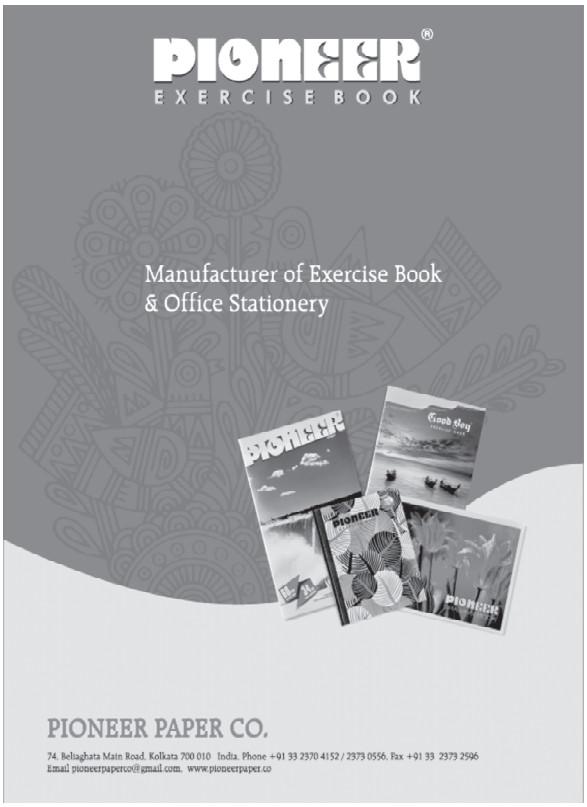

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

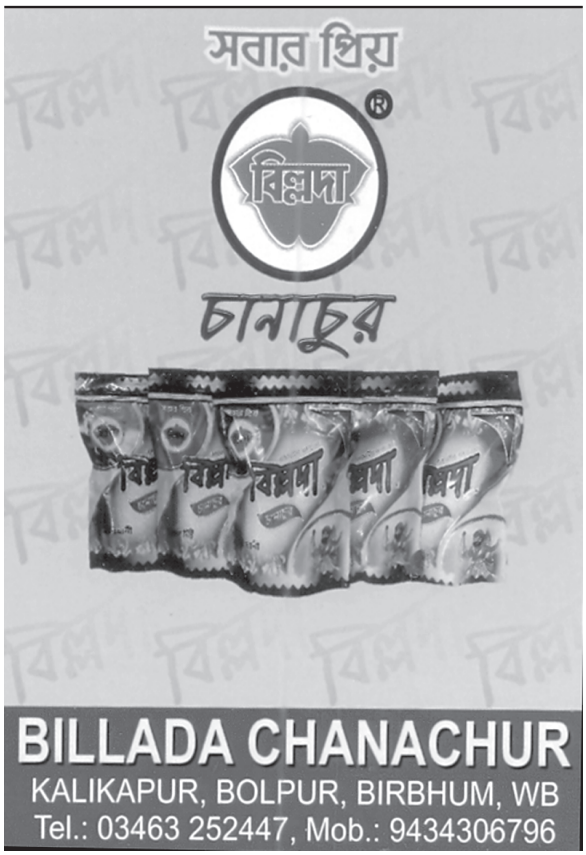

প্রথম আর্যভট্টের বৈপ্লবিক যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা

বিকাশ কুমার ঘোষাল

প্রথম আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন, যুক্তিবাদী তেজস্বী প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর ভাববাদী ধ্যানধারণার এক প্রতিবাদী চরিত্র। তিনি সেই সময়ের সমস্ত ভাববাদী ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা পাল্টে দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা সাধন করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর গতি ও আকার, গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের গতানুগতিক, অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সঠিক ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন; আবার ভাববাদী দার্শনিকদের পঞ্চভূত-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে বস্তুবাদী চার্বাকদের মতো চতুর্ভূত-তত্ত্বে একনিষ্ঠ ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো সংখ্যালগুলিকে বর্ণমালার সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশের জন্য তিনি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এছাড়াও পাই-এর মান নির্ণয়, সময় সম্পর্কে চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

প্রথম আর্যভটের দুখানি গ্রান্থ 'আর্যভট্টীয়' ও 'আর্যভট্ট-সিদ্ধান্ত'-এর মধ্যে প্রাপ্ত 'আর্যভট্টীয়' গ্রন্থটি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সংকলন এবং সম্পূর্ণভাবেই গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা-প্রসূত'। গীতিকা পাদের প্রথম ও শেষ শ্লোক থেকে দেখা যায়— গ্রন্থকারের আরাধ্য দেবতা পরম ব্রহ্ম যিনি এক ও অনেক রূপ বিশিষ্ট এবং পরম ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়ার অর্থই হলো সত্যের সন্ধান পাওয়া। আর্যভট্ট-গবেষক ড. পরমেশ্বর ঝা মনে করেন— এক্ষেত্রে গ্রন্থকার নিজেকে বেদান্তধর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাতিম তলায় ব্রহ্মের উপাসনা করতেন। ভারতীয় দর্শন অনুসারে এ হলো পরম ব্রহ্মের অর্থাৎ পরম সত্যের সন্ধান। আর্যভট্ট বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। পরবর্তী গণিতজ্ঞদের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত, প্রথম ভাস্কর, লল্লাচার্য, শ্রীধরাচার্য শৈব ছিলেন, মহাবীরাচার্য জৈন ও ভাস্করাচার্য সূর্যের উপাসক ছিলেন কিন্তু আর্যভট্ট বিশেষ কোনো দেবতার উপাসনা না করে পরম ব্রহ্মের অর্থাৎ পরম জ্ঞানের প্রার্থনা করে গেছেন— এ মত অধ্যাপক কে.ভি. শর্মা এবং অধ্যাপক রাধাচরণ গুপ্তা প্রমুখ গণিত ইতিহাসবিদদের। এগুলি আর্যভটের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশেষ দিক।

প্রথম আর্যভট্ট ছিলেন বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞানী যিনি 'পৃথিবী স্থির'— এই ভাববাদী বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ভূ-ভ্রমণবাদের পক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির ধারণা দিলেন— 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' (গীতিকাপাদ, ৪) অর্থাৎ পৃথিবী এক প্রাণ বা চার নাক্ষত্র সেকেন্ডে নিজ অক্ষের চারদিকে এক কলা বা এক মিনিট কোণে আবর্তিত হয়। তিনি আরও জানান— 'এক চতুর্যুগে বা ৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষে পৃথিবী ১,৫৮,২২,৩৭৫০০ বার আবর্তিত হয়' যা থেকে পৃথিবীর আবর্তনকাল বা দিনের পরিমাণ দাঁড়ায় $23^{n}56^{m}4.1^{s}$ যা আধুনিক মানের সঙ্গে ($23^{h}56^{m}4.09^{s}$) সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া ভূ-ভ্রমণের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তিনি পূর্বদিকে গতিশীল নৌকাতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তির নদীর উভয় পাশের স্থির বা অচল গাছ, পর্বত প্রভৃতিকে পশ্চিমগামী দেখার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, অনুরূপভাবে লঙ্কাতে অচল নক্ষত্রগণকে সমবেগে পশ্চিমদিকে সরে সরে যেতে দেখা যায়। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি শ্রীলঙ্কা অবস্থিত বলেই শ্রীলঙ্কার সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বলে সুকুমার রঞ্জন দাস, অরূপ রতন ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু যে সত্য আর্যভট্ট সাহসের সঙ্গে লিখতে পারলেন তাঁর গ্রন্থে, বরাহমিহির (৫০০ খ্রিঃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রিঃ) এবং লল্লাচার্য (ষষ্ঠ শতাব্দী) প্রমুখ গণিতজ্ঞ সেকথা মেনে নিতে সাহস পাননি। বরং আর্যভট্টের প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে, গতানুগতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁরা তীব্রভাবে তাঁর সমালোচনা করেন। বরাহমিহির বিরোধিতা করে বলেছেন— ''পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে গতিশীল হলে পতাকা সর্বদা পশ্চিম দিকেই উড্ডীন থাকত এবং পাখিরা একবার আকাশে উড়তে আরম্ভ করলে আর বাসায় ফিরে আসতে পারত না''। লল্লাচার্য 'বিহঙ্গের কুলায় প্রাপ্তি' উল্লেখ করে প্রশ্ন তোলেন— পৃথিবী গতিশীল হলে আকাশ অভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ সর্বদা পশ্চিম দিকে পতিত হয় না কেন বা মেঘ কেবলমাত্র পশ্চিমদিকে ভেসে যায় না কেন? ব্রহ্মগুপ্ত প্রশ্ন তোলেন— 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' যদি হবে তবে কোথা থেকে এই আবর্তন শুরু এবং কোন পথেই বা এই আবর্তন? যদি একই স্থানে এই আবর্তন ঘটে তবে লম্বা বস্তুগুলি পড়ে যায় না কেন?'' অবশ্য ভূ-ভ্রমণবাদকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানান পৃথুদক স্বামিন (৮৬০ খ্রিঃ)। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের ভাষ্য লিখতে গিয়ে তিনি জানান— ''পৃথিবীর আবর্তনের জন্য গ্রহ-ক্ষত্রদের উদায়াস্ত সম্পাদিত হয় এবং এই তত্ত্বের বিরোধিতা লোকমতের বিরুদ্ধে যেতে না পারার জন্যই একে সমর্থন জানাননি''। জনরোষের ভয়ে ও গতানুগতিক বিশ্বাসহেতু ভূ-ভ্রমণবাদের বিরোধী টীকাকারগণ 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূ'-এর পরিবর্তে লিখলেন 'প্রাণেনৈতি কলাং ভম্' অর্থাৎ ভম্ বা গোলীয় জ্যোতিষ্ক গতিশীল হলেও পৃথিবী নিশ্চলাই থেকে গেল আরও এক হাজার বছর। আর্যভট্টের মতবাদের প্রতিধ্বনি করায় হাজার বছর পরে ইউরোপে কোপারনিকাস ব্রুনো, গ্যালিলিওকে অশেষ দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল। এমনকী বিজ্ঞান চর্চাতেও বাধা এসেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরকম কিছু হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে ভারতের বিজ্ঞান ইতিহাসের প্রশংসনীয়

দিক বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রমাতোষ সরকার মনে করেন।

সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি আপন কক্ষপথে বিভিন্ন বেগে আবর্তন করে। গ্রহগতির এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল না। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত (eccentric circle) এবং নীচোচ্চ বৃত্তের (epicycle) সাহায্যে গ্রহগতির আপাত বৈষম্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন আর্যভট্ট। গণিত ইতিহাসবিদ প্রবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁকে Father of Indian Epicyclic Astronomy আখ্যা দিয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর্যভটের একটি সাহসী ও যুক্তিবাদী পদক্ষেপ হলো কেন্দ্র শোধন (eqn of Centre) স্ফুটকর্ণের প্রয়োগ। যুতিশোধনের (eqn of conjunction) ক্ষেত্রে কর্ণের ব্যবহার উপকেন্দ্রীয় ও নীচোচ্চ বৃত্তের তত্ত্বের প্রবক্তাদের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে বলে টি.এস. কুপন্নস্বামী শাস্ত্রী উল্লেখ করেন এবং কেন্দ্রশোধনের ক্ষেত্রে স্ফুটকর্ণের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক বলে দাবি করেন।

পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতো গোল— একথা বর্তমানকালে সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই সত্যের আবিষ্কার হতে বিজ্ঞানের ইতিহাসে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে। পূর্বে মানুষ বিশ্বাস করতো— পৃথিবী সমতল। কিন্তু আর্যভট্ট একথা স্বীকার করেন না বলেই লিখলেন— 'মৃজ্জল শিখি বায়ুময়ো ভূগোল সর্বতো বৃত্ত' (গোলপাদ, ৬)। পৃথিবীর চারদিকেই গোল অর্থাৎ পৃথিবী একটি গোলক। এ কারণে পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে সূর্যোদয় হয় না। একথা বলে তার সপক্ষে তিনি আরও তথ্য দেন— 'যখন শ্রীলঙ্কাতে সূর্যোদয় হয় সে সময় সিদ্ধপুরে সূর্যাস্ত এবং একই সময়ে জাভাতে দুপুর ও রোমকে মধ্যরাত্রি হয়'। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে শ্রীলঙ্কা, সিদ্ধপুর, জাভা ও রোমক এই চার নগরী বিষুবরেখায় অবস্থিত। শ্রীলঙ্কার ৯০° পশ্চিমে রোমক ও ৯০° পূর্বে জাভা এবং শ্রীলঙ্কার ঠিক বিপরীতে (১৮০° ব্যবধানে) সিদ্ধপুর অবস্থিত। এরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাভাবনা সে সময় আর্যভট্ট করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে চার্বাক নামে এক আপোশহীন বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁরা মাটি, জল, আগুন ও বায়ু এই চারপ্রকার ভূতবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। অধিকাংশ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ তাঁদের মূলগ্রন্থে ও ভাষ্যে পঞ্চভূতে আস্থা স্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে একমাত্র বিস্ময়কর ব্যতিক্রম হলেন মহান আর্যভট্ট। পঞ্চভূতের ব্যোম বা আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার না করে তিনি লিখলেন মৃজ্জল শিখি বায়ুময়ো ভূগোল''। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রবল ব্রাহ্মণ্যবাদের অভ্যুত্থানের যুগে সর্বত্র ভাববাদের প্রভাব দেখা যায়। এ যুগে ভাববাদের বিরুদ্ধে কীভাবে আর্যভট্ট বস্তুবাদী চার্বাকদের চতুর্ভুজ তত্ত্বের প্রচার করলেন তা খুবই কৌতূহলের সৃষ্টি করে। আর্যভট্টীয়ের ভাষ্যকার প্রথম ভাস্কর 'মৃজ্জল শিখি বায়ুময়ো ভূগোল' সম্পর্কে লিখেছেন 'প্রত্যক্ষ যৎ উপলভ্যতে' অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ হয়। এই ব্যাখ্যা থেকে বিদগ্ধ গবেষক শ্রীযুক্ত নন্দলাল মাইতি মনে করেন আর্যভট্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী ছিলেন, অনুমানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ফলাফল উপলব্ধি করতেন। এ সকল ছিল আর্যভটের বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা। ভারতীয় পরম্পরা শ্রুতি, সংহিতা, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে রাহু দৈত্যের কারণে গ্রহণ হয়— একথা অধিকাংশ মানুষ স্বীকার করতেন। কিন্তু আর্যভট্ট ছিলেন মূলত পর্যবেক্ষক। পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি গ্রহণের প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিলেন— ''চান্দ্রমাসের শেষে অর্থাৎ অমাবস্যায় চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়লে সূর্যগ্রহণ হয় এবং চান্দ্রপক্ষের শেষে অর্থাৎ পূর্ণিমায় পৃথিবীর ছায়ার ভিতর চাঁদ প্রবেশ করলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। বিখ্যাত ভারত গবেষক অলবিরুনি তাঁর ইন্ডিয়া গ্রন্থে বলেছেন— ব্রহ্মগুপ্ত গ্রহণের সঠিক ব্যাখ্যা জেনেও সত্য থেকে পিছিয়ে গেলেন, কারণ যেহেতু তিনি পুরাণে পড়েছেন যে, গ্রহণের জন্য সূর্য-চন্দ্রকে গ্রাস করতে অবশ্য একটি মুণ্ডের (রাহুর) দরকার, তাই তিনি শেষ পর্যন্ত পৌরাণিক মিথ্যা ধারণাকেই স্বীকার করলেন। আর্যভট্টের পণ্ডিতদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আর্যভট্টের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দেড় হাজার বছর পরেও ভারতবর্ষের মানুষ গ্রহণ অবলোকন করতে সাহস পান না, গ্রহণের সময় খাবারে তুলসীপাতা দিয়ে রাখেন।

পৌরাণিক ধারণা অনুযায়ী একটি মহাযুগকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে ভাগ করা হয়েছে ও এদের সময়কালের অনুপাত 4 : 3 : 2 : 1। আর্যভট্ট এই ধারণাকে অসার আখ্যা দিয়ে বলেন যে, ওই চার যুগের সময়কালের পরিমাণ সমান। তাঁর মতে সময় হলো 'অনাদি অনন্ত'।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত অর্থাৎ পাই-এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি বলেন— 'কোনো বৃত্তের ব্যাস 20,000 হলে তার পরিধির আসন্ন মান হবে 62832'।

$$\text{অর্থাৎ পাই} = \frac{62832}{20000} = 3.1416$$

...যা আধুনিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি এই মানকে আসন্ন বলেছেন যা থেকে এর অমূলদ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আর্যভটের একটি সাহসী পদক্ষেপ হলো বর্ণমালার সাহায্যে বড়ো বড়ো সংখ্যার প্রকাশ। তিনি এক চতুর্যুগের মান দিয়েছেন 'খ্যুঘৃ' বছর অর্থাৎ (খ্ + য্) × উ + (ঘ্ × ঋ) = $(2+30) \times 10^4 + 4 \times 10^6 = 43,20,000$ বছর। ওই সময়ে পৃথিবীর আবর্তন তিনি দিয়েছেন 'ঙিশিবুণ্‌লৃঙ্খ' যার মান (ঙ্ × ই) (শ × ই) (ব্ × উ) (ণ × লৃ) (য্ × খ্) × ঋ = $5 \times 100 + 70 \times 100 + 23 \times 104 + 15 \times 108 + (2+80) \times 106 = 158,22,37,500$। যদিও বর্তমানকালে এগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, তবুও তাঁর পদক্ষেপ যে সাহসী ও যুক্তিসঙ্গত ছিল সেকথা স্বীকার করতেই হয়।

'কুলপ' বা শিক্ষক আর্যভট্ট ছিলেন মূলত একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্রগুলি তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাস করতেন। বর্তমানকালের জ্যোতিঃশাস্ত্র (astrology) তাঁর ধারণার মধ্যে কোনোদিনই ছিল না। তিনি ছিলেন এক বিশুদ্ধ গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী (astronomer)। ■

পুস্তক প্রসঙ্গ

একটি বলিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণব দত্ত মজুমদার লিখিত ‘পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী’ গ্রন্থটি খুবই সময়োপোযোগী। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবনকথা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের শৈশব ও ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে তাঁর শিক্ষাবিদ হওয়া এবং একজন অসাধারণ শিক্ষাবিদ থেকে একজন মানবদরদি রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা, প্রতিটি পর্বেরই অনবদ্য বর্ণনা ও বিশ্লেষণ তিনি করেছেন।

গ্রন্থটি ড. শ্যামাপ্রসাদের আর পাঁচটি জীবনীগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য স্থানে কী কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে চলেছিল, তার বর্ণনা আছে। শুধু ভারতেরই বা বলি কেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলা বিশেষ সমকালীন ঘটনাবলীর বর্ণনাও বিশ্লেষণ রয়েছে।

বহু অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি গবেষকদের প্রভূত উপকার করবে। ১৯৪০ সালের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য যেটি অনেকের অজানা ছিল। সেই বছর জন্মাষ্টমীর দিন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে গুরু মহারাজ প্রণবানন্দজী নিজে ড. শ্যামাপ্রসাদের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলেন---‘‘বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিয়ে গেলাম’’ এই তথ্যটি বাংলার বহু মানুষের কাছেই আজানা ছিল, লেখকের দৌলতে আমরা সমৃদ্ধ হলাম।

গ্রন্থে লেখক যেভাবে গান্ধীজী ও জহরলাল নেহরুর অপরিণামদর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক তোষণ নীতির সমালোচনা করেছেন, তার জন্য সাহসের দরকার। লেখকের তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনাকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে বলে মনে হয় না। লেখকের বুকের পাটার তারিফ করতেই হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট জিন্নার মুসলিম লিগ জেহাদের দ্বারা পাকিস্থান আদায় করে নিয়েছিল। পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়ন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকেও হিন্দু বিতাড়ন চলতে থাকে। হিন্দুদের উপর অত্যাচার সেই প্রথম নয়, ১৯৪৬ সালের ‘কলকাতার নরসংহার’, ‘নোয়াখালির গণহত্যা’ হিন্দু সমাজকে নিঃশেষ করার চক্রান্ত ছিল। নিরীহ হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী হিসাবে চলে আসতে বাধ্য হয়। প্রাণ বাঁচাতে মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে যারা পালাতে পারেনি, তারা হয় ধর্মান্তরিত হয়েছে, নয়তো প্রাণ হারিয়েছে।

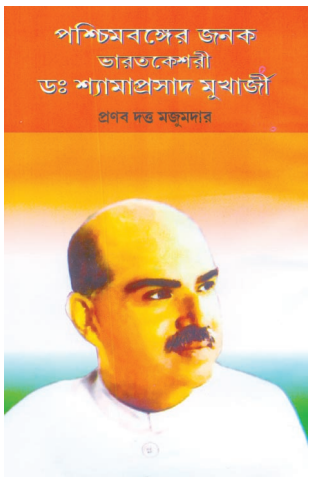

দেশের সকল জননেতা এটা জেনেছেন, দেখেছেন, কিন্তু গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সব কিছু জেনেও চুপ করে ছিলেন, কেউ অত্যাচারী মুসলিম লিগ ও তার দুবৃত্তদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেননি। যেন বাঙ্গালি হিন্দুর প্রাণের কোনও দাম নেই। ১৯৫০ সালেও পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নিধন পর্ব চলে, একমাত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে শাসন ক্ষমতায় যদি মুসলিম শাসক থাকে, তাহলে হিন্দুর সেখানে কোনও নিরাপত্তা নেই। তিনি দেশভাগের পর লোকবিনিময় চেয়েছিলেন, আম্বেদকরও চেয়েছিলেন, কিন্তু নেহরু লোক বিনিময়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন প্রতিবাদ স্বরূপ। নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতার মাশুল আজও বাঙ্গালি হিন্দু দিয়ে চলেছে তাদের সর্বস্ব খুইয়ে।

অবিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম অংশ, যেখানে হিন্দু মেজরিটি, সেই অংশটিও পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল জিন্নার দাবি অনুযায়ী। ড. শ্যামাপ্রসাদ জিন্নার আগ্রাসন থেকে, পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়েছেন। সেই সংগ্রামের পূর্ণ বিবরণ লেখক দিয়েছেন। এই ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম জানে না, কারণ তাদের জানতে দেওয়া হয়নি।

নেহরুর অপরিণামদর্শিতার জন্য আজও কাশ্মীর ভারতের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে রয়েছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরের জন্য ‘এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান’ চেয়েছিলেন। নেহরু ও শেখ আবদুল্লা তাঁর বিরোধিতা করেন। শেখ আবদুল্লা চিরকালই পাকিস্তান সমর্থক, কাজেই তার ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ড. শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরকে পুরোপুরি ভারতের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়। লেখকের কলম তাঁর আত্মবলিদানের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু সেই মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত আজও হয়নি।

গ্রন্থের ভাষা ও পরিবেশন সহজবোধ্য। লেখকের পরিশ্রমের স্বাক্ষর গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে। গ্রন্থের শেষে তিনি তথ্যসূত্র দিয়েছেন একজন প্রকৃত গবেষকের মতো। ড. শ্যামাপ্রসাদের বংশলতিকাও আমরা পেলাম গ্রন্থশেষে। কিছু আছে মুদ্রণ প্রমাদ। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ভুলগুলি এড়ানো যাবে।

পরিশেষে লেখককে ধন্যবাদ জানাই এই অসাধারণ পরিশ্রমসাধ্য কাজটির জন্য। গ্রন্থটি বাংলার স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলে ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। লেখক : প্রণব দত্ত মজুমদার। তুহিনা প্রকাশনী। মূল্য : ১৮৫ টাকা।

শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদধন্য কাঠবেড়ালি

অনেকটা ইঁদুরের মতো। মুখটা বেশ ছুঁচলো। বড়ো বড়ো সংবেদনশীল গোঁফ। দাঁত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। স্বভাবে অত্যন্ত চতুর। জুলজুলে চোখ, তাতে স্টিরিয়োস্কোপিক দৃষ্টি। দুষ্টুমিভরা চেহারা আর দস্যিপনা রকমসকম। বোঝাই যাচ্ছে জীবটির নাম কাঠবেড়ালি। আমাদের অত্যন্ত প্রিয় আর আশেপাশে থাকা এদের কথা কবিতায়, কাব্যে, ছড়ায় ধর্মগ্রন্থে, পাঠ্যপুস্তকে, রূপকথায় আমরা অনেক পড়েছি।

এদের অনেক নাম-- চিরু, রুকি, তুর, ন্যাপালমুসা প্রভৃতি। ইংরেজি নাম স্কুইরেল। মাথা আর লেজ সমেত পাঁচ-ছয় ইঞ্চি থেকে এগারো ইঞ্চি পর্যন্ত দেখা মেলে। লেজটা চমৎকার। খয়েরি-কালচে পিঠে পাঁচটা হালকা বাদামি-সাদাটে দাগ। পেটের দিক ধূসর, দু'পাশ সাদাটে। লেজটা মনে হয় ঠিক যেন ঝাড়ন। খাওয়ার সময় পেছনের দু'পায়ে ও লেজে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বসে সামনের দু'হাতে খাবার ধরে মুখে দেয়। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। ফুল, বীজ, ফুলের কুঁড়ি প্রভৃতি খাদ্য। কচিপাতা, বিস্কুট, বাদাম , লজেন্স দিলেও তৃপ্তি করে খায়। পাকা পেঁপে তো হাপুস -হুপুস করে খায়। একটু সাহস পেলেই একবারে গায়ের ওপর উঠে আসে। কাঠবেড়ালির পিঠে যে পাঁচটি দাগ দেখা যায়, কথিত তা ভগবান রামচন্দ্রের স্নেহের পরশ। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে এর উল্লেখ আছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গল লাগোয়া অঞ্চলে পিঠে তিনটে দাগওয়ালা কাঠবেড়ালি দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। কলকাতা ও শহরতলিতে কমে আসছে কাঠবেড়ালির সংখ্যা। আগে গ্রাম ও শহরে নিশ্চিন্তে বাস করত এরা। মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রার মাশুল ওদের দিতে হচ্ছে। আমাদের রোজকার ব্যবহারের রুমফ্রেশনার, মশা তাড়ানোর বিভিন্ন রাসায়নিক তেলের প্রভাবে কমে যাচ্ছে এদের সংখ্যা। তাছাড়া গাছপালা ধ্বংসের কারণে বাসস্থানের অভাবে এরা হারিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকার ডেলাওয়ারে ডেলমার্ভা নামে বড়ো মাপের এক ধরনের কঠবেড়ালি আছে । সাধারণ কাঠবেড়ালির চেয়ে এরা বেশ বড়ো। ওজন প্রায় দু'কিলোগ্রাম। এরাও বিলুপ্তির পথে। গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ডে এদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আবার উত্তর আমেরিকা ও উত্তর এশিয়ার শীতল বনাঞ্চলেও এদের দেখা মেলে। সমগ্র পৃথিবীতে তিনশোর বেশি প্রজাতির কাঠবেড়ালির দেখা মেলে। উড়ন্ত কাঠবেড়ালি দেখা যায় বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মৌসুমি অরণ্যে। পৃথিবীতে প্রায় তেতাল্লিশ প্রজাতির ফ্লাইং স্কুইরেল আছে। ভারতে আছে কাশ্মীরি ফ্লাইং স্কুইরেল ও নামদফা ফ্লাইং স্কুইরেল। উড়ন্ত কাঠবেড়ালির সামনের পা জোড়ার সঙ্গে পিছনের পা দুটো পাতলা চামড়ার চাদরে জোড়া থাকে। এক গাছ থেকে অনেক দূরের গাছে(নব্বই মিটার পর্যন্ত) বাতাস কেটে যাওয়ার সময় এরা প্যাটাজিয়াম দুটোকে ছড়িয়ে আনেকটা প্যারাশুটের মতো ব্যবহার করে। প্রতিটি প্রজাতিই দেখতে সুন্দর। রঙের বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। মজার ব্যাপার, ভারত ছাড়া কারো পিঠেই ডোরা দাগ নেই।

তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

জয়সলমীর

অতীতের ভাটি রাজপুতদের রাজধানী রাজস্থানের জয়সলমীর। চার পাশে দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি। প্রাচীর ঘেরা শহর। এখানকার বালির রং সোনালি হলুদ। মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ সবই মধু রঙা হলুদ বেলেপাথরে তৈরি। সূর্যাস্তের একটু আগে সোনা রং এবং সূর্যাস্তের মুহূর্তে গোলাপি রঙে ভরে ওঠে বালিয়াড়ি। স্থানীয় লোকেরা সোনার শহর বলে থাকে। সোনার কেল্লা বা রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্ট, জুনা মহল, রং মহল, সর্বোত্তমবিলাস, গজবিলাস, মোতিমহল, বাদলবিলাস, রাওয়াল দুর্গে ৭ টি জৈন মন্দির ও ৪ টি হিন্দু মন্দিরের নানান ভাস্কর্য , মরুভূমির বুকে মরুদ্যান গদি সাগর ও অমর সাগর পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। পান্নার তৈরি মহাবীরের মূর্তি অনবদ্য। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণিমায় এখানে ৩ দিনের ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল বা মরু উৎসব হয়। জয়সলমীরের এটি এক অনন্য আকর্ষণ।

জানো কি?

জানো কী?

- ইন্টারনেটের জনক ভিন্টন কারফ্।
- আধুনিক কমিপিউটারের জনক চার্লস্ ব্যাবেজ।
- কমিপিউটারের সবচেয়ে সরল সংখ্যা পদ্ধতি হলো বাইনারি।
- ডাটাবেসের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে ফিলড।
- সিডি হলো অপটিক্যাল ডিভাইস।
- অক্টা শব্দের অর্থ আট।
- MS Word-এ বানান ঠিক করার জন্য Spell Checker টুলটি ব্যবহার করা হয়।

ভালো কথা

আমাদের কালি

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই কুকুরের ছানার কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঠাকুমা আর মা দাঁড়িয়ে রাস্তায় দুটো কুকুরছানা দেখছে। আমি কাছে যেতেই মা বলল এত ছোটো ছানা দুটোকে কে যেন এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। আমি মাকে বললাম আমাদের কালিরও কদিন আগে সাতটি ছানা হয়েছে, ওখানে রেখে দিলেই তো হয়। মা বলল না না, কালি ওদের মেরে ফেলবে। ঠাকুমা বলল রেখে দিয়ে দেখা যাক না। ছানা দুটো নিয়ে ঠাকুমা কালির কাছে গিয়ে বলল, কালি এই দুটোও তোর, নে। কালি ল্যাজ নাড়াতে লাগল। ঠাকুমা তখন ছানা দুটো কালির ছানার মধ্যে রেখে দিল। ছানা দুটো কালির দুধ খেতে শুরু করল। কালি শুধু ওই ছানা দুটোকে শুঁকে দেখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠাকুমা বলল কালি আমাদের কথা শুনেছে। মায়ের কাছে সব ছানাই সমান।

শ্রেয়া নন্দী, সপ্তম শ্রেণী, গোপালগঞ্জ, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

বুকে উত্তাল ফনির দাপট

রাজিত কুমার সরখেল, দ্বাদশ শ্রেণী, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার

বেড়েছে বড্ড কাজের চাপ চুক্তি ভিত্তিক কাজে,
দিনরাত গাধার খাটুনি স্বল্প বেতনে কি সাজে!
বাড়ি ফিরে রাতের আকাশে দেখি
লক্ষ তারারা আছে শুয়ে
আমি একা অতন্দ্র প্রহরী রয়েছি জেগেই ঘুমিয়ে।
লেখাপড়া শিখে মানুষ হলাম পেলাম কোথায় শিক্ষার দাম!
ডিগ্রিটা রেখেছি শিকেতে ঝুলিয়ে
চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী অফিসে বর্তমান।

নিরুপায় হয়ে মৃত্যুকে পাই ভয়
বুকে উত্তাল ফনির দাপট
পরিচয় আমার বেকার যুবক
সমাজ দেখে কুঁচকে দুচোখ।
পুণ্যের চেয়ে পাপের কাজে
দাম আজ ভয়ানক,
কাক যদি চিলের মামা হয়
অসতের কেন হবে না দাপট!

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২৮।।

ভারতে অসংখ্য দাবা প্রতিভা : অতনু লাহিড়ি

দাবা দুনিয়ায় বিশ্বের ২০০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ। প্রতি বছরই এদেশ থেকে তিন-চারজন গ্রান্ডমাস্টার হচ্ছে। আর এইসব তরুণ প্রতিভাদের খুব কাছ থেকে বেড়ে উঠতে দেখছেন বাঙ্গলার দাবার প্রাণপুরুষ অতনু লাহিড়ি। সম্প্রতি এক খোলামেলা আড্ডায় তার কাছ থেকে জানা গেল অনেক না জানা কথা।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

□ 'গ্লোবাল চেজ ফাউন্ডেশন' নিয়ে কিছু বলুন?

অতনু : 'গ্লোবাল চেজ ফাউন্ডেশন' বাঙ্গলার বেশ কিছু গ্র্যান্ড দাবা খেলোয়াড় দ্বারা পরিচালিত সংস্থা। শহরে এবং মফস্বলে লুকিয়ে আছে অসংখ্য দাবা প্রতিভা। তাদের খুঁজে বের করে সঠিক দিশা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। তার জন্য রাজ্য ও জাতীয় স্তরে 'অনূর্ধ্ব ৭ থেকে অনূর্ধ্ব ১০' পর্যন্ত বয়স বিভাগে সব টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। এই তো সম্প্রতি নিউটাউন স্কুলে সর্বভারতীয় স্তরে এক বড়ো মাপের টুর্নামেন্ট আয়োজিত হলো। সারা দেশ থেকে তিনশোর ওপর ছেলে-মেয়ে খেলতে এসেছিল। এখানে যারা প্রথম তিনে থাকতে পেরেছে তারা আগামীতে বিশ্ব মিটে খেলতে যাবে। এ ধরনের টুর্নামেন্ট করে রাজ্য ও দেশের শিশু প্রতিভাদের দাবার ভিতটা যেমন শক্ত বুনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠে, তেমনি ভারতীয় দাবা প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যও ফুটে ওঠে বিশ্ব পরিসরে।

□ কলকাতায় কটি দাবা অ্যাকাডেমি কাজ করছে?

অতনু : 'গ্লোবাল চেজ ফাউন্ডেশন' ছাড়াও আলেখিন দাবা অ্যাকাডেমি, দিব্যেন্দু বড়ুয়ার দাবা অ্যাকাডেমিও খুব ভালো কাজ করছে। প্রতিটি অ্যাকাডেমি থেকেই ভালো জাতের প্রতিভা উঠে আসছে। এখন বিশ্ব দাবা সংস্থা বা 'ফিডে' যে চেজ এডুকেশন কর্মসূচি নিয়েছে বিশ্বজুড়ে তার সফল রূপায়ণ করতে পেরেছে অল ইন্ডিয়া চেজ ফেডারেশন। দাবার মাধ্যমে যে শিক্ষার আবহ তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ মেধা, মননের বিকাশে দাবার যে গুরুত্ব অপরিসীম তা আজ সব বাবা-মা বুঝতে পেরেছে। তাই প্রতিটি অ্যাকাডেমিতে প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যায় ছেলে-মেয়ে আসছে। এর ফলে কোয়ানটিটির থেকে কোয়ালিটি খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের 'অনূর্ধ্ব ১০' বিভাগে প্রথম দশ জনের মধ্যে ৭/৮ জন ভারতীয় 'চেজ প্রডিজি' অবস্থান করছে। এই ব্যাপারটা কতখানি গর্বের তা নিশ্চয়ই দেশবাসী বুঝতে পারছে। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই ভারত দাবাজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। আর তার জন্য সমস্ত কৃতিত্বই দাবি করতে পারে এইসব অ্যাকাডেমি।

□ সিনিয়রদের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান কীরকম?

অতনু : সিনিয়রদের বিশ্বপর্যায়ে ভারতের অবস্থান চতুর্থ। বিশ্বে প্রায় ২০০টি দেশে নিয়মিত দাবা চর্চা হয়। 'চেজ ইউনিভার্সে' ১৮০টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এবার ভারত চতুর্থ স্থান দখল করছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সূর্যশেখর গাঙ্গুলি, পেন্টাইয়া হরিকৃষ্ণ পদক জিততে সমর্থ হয়েছে। বিদেশে সব প্রথম সারির মিটে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টাররা নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতার পূর্ণ প্রতিফলন দিতে পারছে। মহান বিশ্বনাথন আনন্দ যে গৌরবোজ্জ্বল পথের দিকচিহ্ন তৈরি করে দিয়ে গেছেন, সেই দিকচিহ্নকে দিকচক্রবালে রূপান্তরিত করার গুরুদায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের দাবাড়ুদের কাঁধে ন্যস্ত। আর সেই দায়িত্ব তারা সঠিকভাবে পালন করছে। ভারতে দাবার জনপ্রিয়তা ও ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখে ফিডেও বেশ কিছু পরিকল্পনা পেশ করেছে। যার অন্যতম দেশ জুড়ে দাবাকে স্কুল এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত করা।

□ দাবাকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা কী?

অতনু : আমি নিজে ৯০-এর দশকে বাঙ্গলার প্রথম সারির দাবাড়ু হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলাম। খেলা ছাড়ার পর সক্রিয় কর্মকর্তা হয়েছি। বর্তমানে রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব এবং সর্বভারতীয় দাবা সংস্থার সহ-সম্পাদক। একই সঙ্গে কোচও বটে। ভারতের বয়সভিত্তিক দলগুলিকে নিয়ে নিয়মিত বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলতে যাই। সেইসব টুর্নামেন্টে ভারতীয়রা অসাধারণ সব পারফরমেন্স মেলে ধরে। বুঝতে পারি দাবা খেলাটির প্রতি আগ্রহ দিনে দিনে বাড়ছে জনমানসে। আর তার সঙ্গে শ্লাঘা অনুভব করি এটা ভেবে যে আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম সঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে। যে কোনও খেলায় আন্তর্জাতিক স্তরে ছাপ ফেলতে চাই কর্মকর্তাদের দূরদর্শিতা ও মিলেমিশে কাজ করার সদিচ্ছা। গত কয়েক দশকে এই ব্যাপারে কোনোরকম খুঁত দেখা যায়নি। ফিডের প্রতিটি কর্মসূচি সঠিকভাবে পালন করেছে সর্বভারতীয় ও রাজ্যসংস্থাগুলি।

□ এশিয়াড, কমনওয়েলথে দাবার অন্তর্ভুক্তি কি সমর্থন করেন?

অতনু : অবশ্যই। এশিয়াডে দাবা ইতিমধ্যেই স্থানলাভ করেছে। এই ধরনের ইউনিভার্সাল ইভেন্টে খেললে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি ঘটে। এ এক ধরনের মহামিলন স্থল। সব খেলাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। আর সব খেলাই পারে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। তার মধ্যে দাবা শিক্ষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন করে। ■

অভাব পেরিয়ে অভাবীর পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জীবনের যে কোনও উত্তরণের প্রেক্ষাপটে কোনও না কোনও যন্ত্রণাময় উপলব্ধি থাকে। মানুষ বড়ো হয়, কীর্তিমান হয়, কিন্তু সেই যন্ত্রণাময় অতীত কখনও ভোলে না। আলিপুরদুয়ারের ডিমডিমা চা-বাগানের সাজু তালুকদারও ভোলেননি। ঠিক স্মৃতিরোমন্থন নয়, এগিয়ে যাওয়ার গল্প বলার তাগিদেই সাজু মাঝে মাঝে খুলে দেন তার স্মৃতির ঝাঁপি।

সাজুকে হয়তো অনেকেই চিনবেন। কিছুদিন আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদাগিরি অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। সৌরভের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সরকারি স্কুলে ইউনিফর্ম পরে যাবার রীতি আছে। ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হবার পর আমার বাবা পুরনো জামাকাপড় বিক্রি হয় এরকম একটা দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। দোকানের মালিক আমার মাপ নিয়ে একটা সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট দিলেন। ক্লাস ফাইভের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার সময় আমার ইউনিফর্ম ছিঁড়ে গেল। নতুন কিনে দেবার ক্ষমতা বাবার ছিল না। স্রেফ ইউনিফর্ম না থাকার কারণে আমাকেও পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়েছিল।'

বলা বাহুল্য, কথাগুলো বলতে বলতে সেদিন চোখে জল এসে গিয়েছিল সাজুর। একজন সাতচল্লিশ বছরের মানুষ যত না অভাবে কাঁদেন, তার থেকে বেশি কাঁদেন অভাববোধে। এত সামান্য কারণে পড়াশোনা করতে না পারার কষ্ট পীড়া দেয় বই কী! কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাঁর চোখের জল ব্যর্থ হয়নি। আজ তিনি ড্রাইভার। তবে সেটা তাঁর বাহ্যিক পরিচয়। প্রকৃত পরিচয় তিনি আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে গরিব মানুষের বস্ত্রের ভাণ্ডারী। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদের দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই অসহায় মানুষগুলো লজ্জা নিবারণ করতে পারেন। তারা জানেন ভরপেট খেতে না পাওয়ার দুঃখ থাকলেও, জামাকাপড়ের অভাব তাদের নেই। তার জন্য সাজু আছেন। এবং সাজু থাকবেন।

এই মহামানবিক দায়বদ্ধতা পালনের গোড়ার কথা সাজুর কাছেই শোনা। ২০১৭ সালে

অন্য রকম

সাজু প্রতিষ্ঠা করেন বীর বিরসা মুণ্ডা ক্লথ ব্যাঙ্ক। ঠিকানা শিলিগুড়ি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ডিমডিমা চা-বাগান। অবশ্য ব্যাঙ্ক ২০১৭ সালে তৈরি হলেও এই কাজে সাজুর হাতেখড়ি আরও অন্তত দশ বছর আগে। এখন ব্যাঙ্কের স্টকে রয়েছে ৫০,০০০ পোশাক। প্রত্যেক সপ্তাহে ৩০০০-৪০০০ পোশাক চা-বাগান, রেলস্টেশন আর বাসস্টপের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করা হয়।

সাজুর বাবার ছিল দরজির দোকান। সাজুকেও এক সময় দরজির কাজ শিখতে হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন তার এসব ভালো লাগেনি। সেই সময় নদীর জল থেকে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে লরি এবং ট্রাকের মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানায় পাঠানো হতো। ড্রাইভারদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে সাজু গাড়ি চালানো শিখে নিলেন। লরি চালাবার চাকরি একটা জুটে গেল। ২০০৮ সালে অফিসের গাড়ি চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি চাকরিটা ছেড়ে দেন। লরির ড্রাইভারি করতে করতে সাজু চা-বাগানের জীবনকে কাছ থেকে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, লোকে ডাস্টবিনে থেকে খাবার কুড়িয়ে খায়, পোশাকের অভাবে অর্ধোলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই সময়েই এদের জন্য কিছু করার কথা তিনি ভেবেছিলেন।

তার এই কষ্ট দেখে মনে হয় মানুষটা আগাগোড়া সৎ। অন্য কেউ হলে এতদিনে রাজনীতির রং লাগিয়ে দিত। মাঝারি মাপের নেতা-টেতা হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সাজু আড়ালে থাকতে ভালোবাসেন। একদিন পোশাক ছিল না বলে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। শুধু এইটুকুই তার সম্বল। এই কাঁটায় ভরা গোলাপ যতক্ষণ তার সঙ্গী ততক্ষণ সাজুর পথ হারাবার ভয় নেই।

পশ্চিম বাংলাদেশ গঠনে মমতা ব্যানার্জির পদক্ষেপ

স্বপ্নময় ভট্টাচার্য

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম ভারতবর্ষের শৌর্য বীর্যের প্রতীক। তাঁর নামে জয়ধ্বনি ভারতবর্ষের সকল হিন্দুই দলমত নির্বিশেষে দিয়ে থাকে। বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগে গোটা পৃথিবীটাই হাতের মুঠোয় এসেছে। ফলত উত্তরপ্রদেশের স্লোগান পশ্চিমবঙ্গে, আবার পশ্চিমবঙ্গের স্লোগান কেরলে খুব সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাছাড়া বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের অস্মিতা ও আত্মবিশ্বাস পুনর্জাগরিত হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনি আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রশ্ন হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই স্লোগান শুনে খেপে যাচ্ছেন কেন? তিনি কি আদৌ খেপে যাচ্ছেন। নাকি খেপার ভান করছেন? মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত কৌশলী, নাটুকে ও ধুরন্ধর নেত্রী। তিনি সেখানেই রাগ প্রদর্শন করেন সেখানে তার লাভ দেখেন। সেকারণেই প্রথম যখন তিনি রাস্তায় কনভয় দাঁড় করালেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে তাঁর খেপে যাওয়াকে অনেকেই বালখিল্য আচরণ হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং তার বিখ্যাত সাংবাদিক সম্মেলন, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন, ইমরান হাসানকে সাংসদ করা, খাগড়াগড় বিস্ফোরণ এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান প্রত্যেকটি এক সূত্রে গাঁথা এবং লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমে আসি ইমরান হাসানকে সাংসদ করা নিয়ে। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় গড়ে তোলেন ইসলমিক সন্ত্রাসবাদী ছাত্র সংগঠন এস আই এম আই। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে তিনি একজন জেহাদি নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। তার সেই মুসলমান ইমেজ ব্যবহারের জন্য তার সাপ্তাহিক 'কলম' পত্রিকা সারদা গ্রুপ অধিগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে। তার পরের উত্থান আরও চমকপ্রদ। একেবারে রাজ্যসভার সাংসদ। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ একজন মুসলমান জেহাদি নেতা। তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ থেকে মুসলমানদের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। একই সঙ্গে জেহাদি ইসলামিক সংগঠনগুলিকেও বার্তা দেওয়া যে দুই বাংলার একত্রীকরণ বা বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনেও সঙ্গে রয়েছে তৃণমূল।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ এই শব্দ বন্ধেই রয়েছে ইতিহাস।

হামলাকারীদের হাতে আক্রান্ত জুনিয়র ডাক্তারের চিকিৎসা চলছে।

পশ্চিম থাকলে পূর্ব কোথায় গেল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালি দাঙ্গা-সহ হাজারো দাঙ্গা। দ্বিজাতি তত্ত্ব। কংগ্রেসের দ্বিচারিতা, কমিউনিস্টদের ভারত বিরোধী মনোভাব সহ গত শতকের প্রথমার্ধের এই ভারতভূখণ্ডের সম্পূর্ণ ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঠিক তথ্য যাতে বর্তমান ছাত্র যুব সমাজ মনে না রাখে তার দিকে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই যত্নবান। তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষিত মুসলমান তোষক দল হিসেবে মুসলমানদের দাঙ্গার ইতিহাস মুছে দিতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আর এর জন্য তারা জুটিয়ে নিয়েছে কিছু তাবেদার বুদ্ধিবেচাদের। তারাও কাড়ানাকাড়া দুন্দুভি বাজিয়ে নেত্রীকে সমর্থন করার জন্য জুটে গেল। তারা সবাই জানে ইতিহাসের গুরুত্ব কতটা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ইতিহাস বিস্মৃত জাতির ধ্বংস অনিবার্য।' এর অর্থ আমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ গঠন ত্বরান্বিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য মুসলমান সমাজ তৃণমূলের আরও নিকটে আসবে এটা স্বাভাবিক প্রবণতা।

বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ এখন বাংলাদেশি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন-সহ পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলোর মুক্তাঞ্চল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর আন্তর্জাতিক সীমানা, নেপালের সঙ্গে বাধাহীন যোগাযোগ এবং সর্বোপরি শাসকের প্রশ্রয় এর অন্যতম কারণ। তদন্তে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত বোমা ঢাকায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের নাশকতার সংখ্যা কম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে কালিয়াচক কাণ্ড ও খাগড়াগড় কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের তদন্ত যে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যায়। এর থেকেই অনুমান করা যায় শাসকের সঙ্গে জেহাদি গোষ্ঠীর গোপন আঁতাতের। আমরা তোমাদের আশ্রয় দেবো, তোমরা আমাদের বাড়িতে কিছু করো না। অথবা জেহাদি জঙ্গিরা এটাও ভাবতে পারে যেখানে সরকার তাদের কাজ করছে সেখানে তাদের নতুন করে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। তবে শাসকদলের প্রশ্রয়ে, কখনও কখনও উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে

ফঃ ৬

ইসলামিক সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। নাখোদা মসজিদের ইমামের দেওয়া ফতোয়া নিশ্চয়ই আমরা ভুলে যাইনি। আমরা উলুবেড়িয়ার ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েটির মাথা ফাটা ছবিটা ভুলে যাইনি। তার অপরাধ ছিল তাদের প্রিয় বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করতে দিতে হবে। কলকাতার রাজপথে যারা পাকিস্তানের পতাকা হাতে মিছিল করেছিল তাদের কাউকেই কিন্তু পুলিশ গ্রেপ্তার করেননি। আর কালিয়াচকে একটি থানা জালিয়ে দেওয়া হলো অথচ পুলিশের বন্দুক নীরব রইল। এর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গকে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাষাগত মিল থাকলেও ভাষার টান এবং শব্দচয়নের একটা ফারাক নজরে পড়ে। পরবর্তীতে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পথে এই ফারাক যাতে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নির্দেশে মাথায় তুলে নিয়েছেন বিদ্যালয় সিলেবাস কমিটি! এ ব্যাপারে সকলেই অবগত যে বিদ্যালয় স্তরের প্রত্যেকটি বিষয়ে ইসলামিক শব্দের বহুল ব্যবহার। এই বিষয়ে ড. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের লেখা সোশ্যাল সাইটে ঘুড়ছে। এসবই হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য এবং বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই তোষণের শুরু। মমতা সরকার পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেখানে শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্রীদের দেওয়া হয়। এনিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা হলে পরবর্তীতে হিন্দুছাত্রীদেরও দেওয়া হয়। এনিয়ে এবিভিপি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুললে সরকার বাধ্য হয়ে 'সবুজসাথী' প্রকল্প চালু করে এবং সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা বোর্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিকের ফলাফল প্রায় একই সময়ে বেরোয়। এখানেও তোষণ। ২০১৪ সালে মাদ্রাসায় প্রথম দশের সংবর্ধনায় মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে প্রত্যেককে একটি করে ল্যাপটপ উপহার দেন, অথচ মাধ্যমিকে প্রথম দশ স্থানাধিকারিকে শুধুমাত্র দু'একটি বই।

সবার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ খাতে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপে ৫০ শতাংশ নম্বর প্রয়োজন। কিন্তু স্কলারশিপ সকলকেই দেওয়া হয়েছে। এখনো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ৯৭ শতাংশ মুসলমান ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ওবিসি স্কলারশিপ এবং মাইনরিটি স্কলারশিপ উভয়ই পাচ্ছে। আধার কার্ডের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করার এটিও একটি কারণ।

লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই মমতা ব্যানার্জি এক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। সেইখানে তিনি মুসলমানদের ত্রাতা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার প্রয়াস করলেন। তিনি বললেন 'দুধ দেওয়া গোরুর লাথি খাওয়াও ভালো।' (ভাবানুবাদ) এই বক্তব্যে পরিষ্কার তিনি সংখ্যালঘুদের যতটা গুরুত্ব দেন সংখ্যাগুরুদের ততটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি সংবিধান মেনে যে শপথ নিয়েছেন তা তিনি মানেন না। 'দুধ দেওয়া গোরুর লাথি খাওয়া' অর্থাৎ সংখ্যালঘুরা অপরাধ করলেও তা তিনি সহ্য করে নেন এবং নেবেন। এই বার্তা দেওয়ার পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই জেহাদি মুসলমানরা তাদের কার্যকলাপে উৎপাহ পাবে এটা মুখ্যমন্ত্রী বেশ ভালো করেই বোঝেন। নীলরতন হাসপাতালে ডাক্তারদের ওপর হামলা তাঁর ইঙ্গিতকে প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পথে এটিও একটি সুস্পষ্ট বার্তা।

মমতা ব্যানার্জির 'জয় বাংলা' শব্দ বন্ধ প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' তাদের ১১ দফা কর্মসূচির মধ্যে 'জয় বাংলা' স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে এই স্লোগান বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য একটি জনপ্রিয় এবং উৎসাহ বর্ধক স্লোগান হিসেবে উচ্চারিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রমনা রেস কোর্স মাঠে যে জমায়েত হয়েছিল তা 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। 'বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজ'-এর স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সেই উপলক্ষে বাংলাদেশ রেডিয়োতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ভাষণ রাখেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি ভাষণ সমাপ্ত করেন 'জয় বাংলা' বলে।

এখন প্রশ্ন হলো, অন্য দেশের এমন একটি ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যবহৃত স্লোগান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ব্যবহার করতে এত তৎপর কেন? তিনি কি এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত নন? এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ছবির কোলাজ-সহ এই স্লোগান লেখা হয়েছে তা কতটা সমীচীন? মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই এই স্লোগান ব্যবহার করেছেন বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হওয়ার জন্য। সবচেয়ে যন্ত্রণার কথা, এই কাজে তিনি জনতার দেওয়া সাংবিধানিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছেন। তিনি এই লক্ষ্যে মহাপুরুষদের ছবি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন। যাদের ছবি তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁরা সকলেই প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে এবং তাঁদের অনেকেই আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

বর্তমান শাসকদলের একটি বড়ো সমস্যা তারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ দল বলতে পারছে না। তৃণমূল চেষ্টা করেও নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তারা চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। বিজেপিকে এই বিষয়েও সাবধান হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের এই দুঃসময়ে জাতীয়তাবাদী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের আরও অনেক বেশি বেশি করে যেতে হবে। তৃণমূলের অভিসন্ধি তাদের সামনে উন্মোচন করতে হবে। সাধারণ মুসলমান সমাজে কিন্তু বৃহত্তর বাংলাদেশ চান না। সে কারণে তাদের পাশে থাকার বার্তাও পৌঁছে দিতে হবে। জেহাদি তৃণমূলের হাত থেকে বাঙ্গলার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনাই এখন দেশপ্রেমিক মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ▮

হে আলোর পথযাত্রী...

সুমনা পাল ভট্টাচার্য

স্বর্ণযুগের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী প্রয়াত গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকাশ ভট্টাচার্য গত ১৪ জুন রাত ২-৫৫ মিনিটে মৃত্যুলোকে পাড়ি দিলেন। কথায় বলে, নামের প্রভাব মানুষের স্বভাবে প্রতিফলিত হয়, এক্ষেত্রে এই কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। ১৯৪৪ সালের ৮ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম। পড়াশুনা, বেড়ে ওঠা সবই প্রায় উত্তর কলকাতাকে কেন্দ্র করে।

একসময় তাঁরা ছিলেন সাত ভাই আর এক বোন। প্রখ্যাকত সঙ্গীতশিল্পী গৌরীকেদার কোনোদিনই তেমন সংসারমুখী না থাকায়, ও একটা সময়ের পর গৃহী সন্ন্যাসী রূপে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, যুবক বিকাশ ভট্টাচার্যের উপর খুব অল্প বয়সেই সংসারের সব ভার এসে পড়ে। ক্রমে মায়ের ভাঁড়ারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ও ভাই-বোনেদের অভিভাবক তিনিই হয়ে ওঠেন।

যে বয়সে একজন যুবক বন্ধু-বান্ধব, হাসি-মজায় জীবনের উচ্ছ্বাসকে যাপন করেন, বিকাশ ভট্টাচার্য সেই বয়সে অর্থ সংস্থান ও পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর ভাইদেরও তিনি এই একই মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণতা দেখা গেছে। সাবলীল ভাবেই তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। খুব ছোটো থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কঠিন নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে তাঁর চরিত্র ও চেতনার সুদৃঢ় কাঠামো গঠিত হয়, যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে এতোটাই ধারালো করে তোলে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর কাজের ভেতরে সেই স্বয়ংসেবকত্বের ছাপ রেখে গেছেন।

পেশাগত ভাবে তিনি দেনা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। কর্মজগতের পাশাপাশি বরাবর তিনি বিভিন্ন পড়াশুনা, গান, নাটক, লেখালেখি এসবের ভেতর নিজেকে খুঁজে নিয়েছেন। খুব অল্প বয়েস থেকেই তাঁর ভেতর যে সংগঠক চেতনা বেড়ে উঠেছিল তা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় তাঁর বিভিন্ন সংগঠনে দায়িত্বের সঙ্গে নিজের ছাপ রেখে যাওয়ার ভেতর দিয়ে। স্বস্তিকা পত্রিকায় রঙ্গম বিভাগে তাঁর নিয়মিত নাট্য সমালোচনা পাঠকদের সমৃদ্ধ করেছে। স্বস্তিকাও তাঁকে 'স্বস্তিকা সম্মান'-এর ভূষিত করে তাঁর প্রতিভাকে সম্মান জানিয়েছে।

১৯৯২-৯৩ সাল থেকে তিনি অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সংস্কার ভারতীর' সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর মূল্যবান মতামত, উপদেশ, বিভিন্ন পরামর্শ সংস্কার ভারতীকে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করে তুলেছে একথা অনস্বীকার্য। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি এই সংগঠনের প্রাণ পুরুষ হিসেবে নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বহুদিন তিনি সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সমিতির নাট্য প্রমুখ হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁর ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত দরাজ কণ্ঠস্বর। তাঁর শ্রোতাদের বিশ্বাস করতে অসুবিধে হতো যে তিনি সেভাবে তালিম নিয়ে কখনো সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেননি। একই ভাবে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল নাটকের প্রতি। শুধু সুদক্ষ অভিনেতাই নয়, তিনি ছিলেন যথার্থ ভাবে একজন নাট্য কর্মী, নাট্যযোগী। বিভিন্ন নাটক তিনি নিজে লিখেছেন ও সফল ভাবে পরিচালনা করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হলো— '২৩ জুন' মঞ্চস্থ হয়েছিল সম্ভবত ২০০২ সালে। এই নাটকটি লেখা থেকে পরিচালনা সবটাই তাঁর নিজের। এরপর সম্ভবত ২০০৩ সালে তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'নিষাদ', যেটি লেখা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। এরপর ২০০৫ সালে সমরেশ মজুমদারের 'ঠিকানা ভারতবর্ষ' তাঁর পরিচালনা দর্শকের মনে সাড়া ফেলে দেয়। সম্ভবত ২০০৭ সাল। এরপর তাঁরই লেখা ও পরিচালনায় 'ক্রান্তিকাল' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং অসম্ভব জনপ্রিয়ও হয়। ২০০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষ রক্ষা' তাঁর পরিচালনার গুণে এক অন্য মাত্রা লাভ করে। ২০১০ সালে তাঁর সুদক্ষ লিখনী ও সফল পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় নাটক 'রাজযোগী'। এরপর ২০১১ সালে সুচিত্র ভট্টাচার্যের বিখ্যাত উপন্যাস 'অলীক সুখ'-কে তিনি নাট্যরূপ দেন। তাঁর পরিচালনায় সেই নাটকটিও বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। এর বাইরেও অজস্র নাটক তিনি বিভিন্ন সময় দর্শকদের উপহার দিয়ে গেছেন। একটি কথা বলতেই হয়, তিনি ছিলেন আজন্ম শিক্ষার্থী।

যেখানে যা নাটক মঞ্চস্থ হতো, তিনি সম্ভব হলেই তাঁর উৎসাহের হাত বাড়িয়ে দর্শক হিসেবে সেখানে উপস্থিত হতেন এবং সঠিক মূল্যায়ন ও আলোচনার ভেতর দিয়ে প্রত্যেককে আরও এগিয়ে দিতেন চার ধাপ।

তিনি ছিলেন শিক্ষক, তিনি ছিলেন পিতা, তিনি ছিলেন পরম সহিষ্ণু ধারক। যিনি বিশ্বাস করতেন কেবল রক্তের সম্পর্কই নয়, সম্পর্ক আত্মার, সম্পর্ক মানবিকতার, সম্পর্ক মননের সঙ্গে মননের। তাই শুধু যে তিনি তাঁর নিউ আলিপুরের বসতবাটিতে তাঁর দুই কন্যা ও স্ত্রীকে রেখে গেলেন তাই নয়, তিনি পিছনে ফেলে গেলেন এমন অজস্র গুণমুগ্ধকে যারা তাঁর প্রেরণায়, চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও প্রতিষ্ঠিত।

জীবনের ব্যপ্তিকাল সময়ের নিরিখে মান্যতা পায় না, পায় কর্মযোগে। আর সেই অর্থে তাঁর সমস্ত কাজের ভিতর দিয়ে, তাঁর সান্নিধ্যে আসা প্রতিটি মানুষের ভিতরে তাঁর অটল আসন পাতা সেই অনুভবের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবিত থাকবেন, অবিনশ্বর ও ভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আজ এটুকুই প্রার্থনা করব, তাঁর ওই ঋজু মেরুদণ্ড, সততা, সময়ানুবর্তিতা, কাজের প্রতি অটল নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা ও প্রবল ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়েও দুচোখে স্বপ্ন জ্বালিয়ে রাখার অদম্য প্রয়াসকে যেন নিজেদের ভিতর বহন করে নিয়ে যেতে পারি।

হে আলোর পথযাত্রী তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম। চিরশান্তি, চিরমুক্তির সমাধিতে তুমি শান্তিতে থেকো, ভালো থেকো। ■

ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রশংসায় ড. জিতেন্দ্র সিংহ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, গণঅভিযোগ ও পেনশন, আণবিক শক্তি এবং মহাকাশ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ ভারতীয় মহাকাষ সংস্থার (ইসরো)-র চেয়ারম্যান ড. কে শিবানকে সঙ্গে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সম্মেলনে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দায়বদ্ধতা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রয়োগ বর্তমানে পরিকাঠামো, বিপর্যয় ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে সফল হচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। গগনযান মিশন সম্পর্কে ড. সিংহ বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগেই ভারত মহাকাশে নভঃচারী পাঠাবে। এই মিশনে সরকার ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করেছে।

ইসরো ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে গগনযানের বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সেই অনুযায়ী ভারতীয় বায়ুসেনা নভঃচারীদের বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেবে। ইসরোর চেয়ারম্যান জানান, সূর্য-অভিযান আদিত্য এল-১ কর্মসূচি ২০২০ সালে শুরু করা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো সূর্যের করোনা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে তার প্রভাব। সাংবাদিক সম্মেলনে মহাকাশ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পিএম কিষানের সুবিধা পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর আবেদন

কেন্দ্রীয় কৃষি ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার এক ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের কৃষিমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে 'প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা', ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অবসর ভাতা কর্মসূচি ওবং কিষান ক্রেডিট কার্ড অভিযানের মতো ভারত সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রূপায়ণের ওপর আলোচনা হয়। ২০১৯-এর জুলাই 'পিএম কিষান'-এর অন্তর্গত প্রাপ্য সুবিধা যাতে প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যায়, তারজন্য সময় বেঁধে সব উপযুক্ত কৃষক পরিবার বা ব্যক্তির নাম দ্রুত নথিভুক্ত করার জন্য এবং ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সি কৃষকদের জন্য অবসর ভাতা কর্মসূচির বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে আবেদন জানান কৃষিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আগামী ১০০ দিনের মধ্যে কিষান ক্রেডিট কার্ড কর্মসূচির কথা দেশের

১ কোটি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে গ্রাম ভিত্তিক প্রচার অভিযান শুরু করতে হবে। পিএম কিষান যোজনা কৃষকদের বাড়তি আয় জোগাবে। এটি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় কর্মসূচি। তিনটি সমান কিস্তিতে প্রতি বছর ৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে কৃষকদের। ২০১৯-এর ১ এপ্রিল থেকে এই কর্মসূচি সব কৃষকদের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক এই সুবিধার আওতায় পড়বেন। এর জন্য পিএম কিষান পোর্টালে সঠিক তথ্য দিতে হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য অবসর ভাতা কর্মসূচির আওতায় সব কৃষক রয়েছেন। এই কর্মসূচিতে ৬০ বছর বয়স হলেই কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে। প্রথম পাঁচ বছর পাঁচ কোটি কৃষক এই সুবিধা পাবেন। এর জন্য সব কৃষককে ২৯ বছর প্রতি মাসে ১০০ টাকা জমা করতে হবে।

১৯৯৮ সালে আমাদের দেশে কিষান ক্রেডিট কার্ড চালু হয়। ১৪ কোটি ৫ লক্ষ কৃষি জমির মালিকের মধ্যে ৬ কোটি ৯২ লক্ষ কিষান ক্রেডিট কার্ড রয়েছে। এখন এর আওতায় আনা হয়েছে পশুপালন ও মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষকদের এই কল্যাণকর প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য সব রাজ্যকে সচেষ্ট হতে হবে।

সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য জাতীয় চরিত্র নির্মাণ : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'জাতীয় চরিত্র মানুষের ব্যক্তিগত' চরিত্রের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জাতীয় চরিত্র নির্মাণ সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হলো জাতীয় চরিত্র নির্মাণের একটি মঞ্চ। আর ভারতমাতার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি হলো জাতীয় চরিত্র নির্মাণের প্রেরণা। আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করব দেশের কোণে কোণে জাতীয়তার বোধ ছড়িয়ে দিন। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে এই কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাগপুরের রেশিমবাগে ডা. হেডগেওয়ার স্মৃতি ভবন চত্বরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশের ৮৩৮ জন স্বয়ংসেবক বর্গে অংশগ্রহণ করেন। সমারোপ অনুষ্ঠানে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, 'এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা নিশ্চয়ই একটা সমাপতন লক্ষ্য করেছেন। পাঁচ বছর আগেও তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শেষ হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই, এবারও তাই। আরও একটা সমাপতনের কথা উল্লেখ করব। পাঁচ বছর আগে শিক্ষাবর্গ শেষ হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। এবারও তাই।' সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় সম্বন্ধে শ্রীভাগবত বলেন, সরকার এর আগেরবার মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু তার জন্য মানুষ বিশ্বাস হারায়নি। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য বিজেপিকে আরও একবার সুযোগ দিয়েছে।

ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র সমালোচনা করে শ্রীভাগবত বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলিতে তাঁর প্রথম ভাষণেই সুস্থ গণতন্ত্রের ওপর কী ধরনের আঘাত ভবিষ্যতে নেমে আসতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। স্পষ্ট বলেছিলেন, বাইরের বিপদ নয়, ব্রিটিশ শক্তি এতদিন ভারতকে পরাধীন করে রেখেছিল আমাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের জন্য। দলদাস মনোভাবের এই সর্বময়তা গণতন্ত্রের সবথেকে বড়ো শত্রু। তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচন শেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এবার শেষ হওয়া উচিত। জয়ী দলের উচিত দেশ নির্মাণের কাজে অগ্রসর হওয়া আর অন্য দলগুলির উচিত এই কাজে সহায়াক ভূমিকা পালন করা।'

জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে জ্যৈষ্ঠ অষ্টমী বছরের সর্বাপেক্ষা শুভ ও পবিত্র দিন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জ্যৈষ্ঠ অষ্টমী উপলক্ষে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের শুভেচ্ছা জানান। কাশ্মীরি এবং ইংরেজিতে লেখা শুভেচ্ছাবার্তার বয়ানটি এইরকম : মা ক্ষীরভবানীর কাছে প্রার্থনা করি তিনি সবাইকে ভালো রাখুন এবং সকলের যাতে উন্নতি হয় সেই আশীর্বাদ করুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একটা বড়ো অংশ দেবী ক্ষীরভবানীর ভক্ত। শ্রীনগর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে দেবীর মন্দির অবস্থিত। যে গ্রামে দেবীর মন্দির তার নাম তুলমুলা। স্বামী রামতীর্থ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রত্যেক বছর হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত মন্দিরে পুজো দেন।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৪০তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ৩০শে জুন, ২০১৯

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

রামমন্দির নির্মাণে অর্ডিন্যান্সের দাবি শিবসেনার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করার দাবি করল শিবসেনা। সম্প্রতি শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে মুম্বইতে বলেন, সংসদে এন ডি এ-র সাড়ে তিন শতাধিক সদস্য রয়েছেন। সুতরাং কেন্দ্রের উচিত এখনই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন উদ্ধব ঠাকরে এবং তাঁর পুত্র আদিত্যসহ শিবসেনার নির্বাচিত ১৮ জন সাংসদ রামলালা দর্শন করতে অযোধ্যায় যান। রামলালার পুজো দেওয়ার পর উদ্ধব ঠাকরে বলেন, অর্ডিন্যান্স জারি করে রামমন্দির নির্মাণ করার সাহস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আছে এবং তিনি যদি তা করতে চান তাহলে তাকে বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি হিন্দুদের আবেগের সঙ্গে জড়িত। সেই জন্যই যত দ্রুত সম্ভব মন্দির নির্মাণ করা জরুরি।'

তিনি স্লোগান দেন, 'কানুন বানাও, মন্দির বানাও।' উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেন, কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। মহন্ত নিত্যগোপাল দাসের উপস্থিতিতে তিনি বলেন, রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের দুটি রাস্তা খোলা রয়েছে। ইসলামিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলা অথবা আদালতের নির্দেশের ওপর নির্ভর করা। আমার মতে, এই দুটি চেষ্টাই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কেন্দ্রের এই বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করা উচিত।

সামাজিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রাক্-বাজেট আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ তাঁর প্রাক্-বাজেট আলোচনার পঞ্চম পর্যায়ে সম্প্রতি সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

শ্রীমতী সীতারমণ বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের জীবনযত্রার মান নির্ভর করে। বর্তমান সরকার শিক্ষার মান, যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, রোগব্যাধির কারণে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস, মহিলাদের ক্ষমতায়নের মতো বিষয়গুলির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আজকের বৈঠকে স্বাস্থক্ষেত্র (প্রাথমিক চিকিৎসা, আয়ুষ, আয়ুর্বেদ), শিক্ষা (বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা), সামাজিক সুরক্ষা (বার্ধক্য, মহিলা ও শিশু, দলিত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং যুব সম্প্রদায়), পেনশন, মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে অর্থ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকররা উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিত্বরা শিক্ষা এবং স্বাস্থকর পরিবেশ (মূলত গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের জন্য) মহিলাদের সুরক্ষার জন্য শহরাঞ্চলে নজরদারির ব্যবস্থা, সদ্যোজাত এবং গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টির জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, সমস্ত জেলায় মহিলাদের জন্য এক জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার বৃদ্ধি, বিনামূল্যে ওষুধ এবং রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা, মডেল স্কুল নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, মাধ্যমিক পরবর্তী বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য অর্থ বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

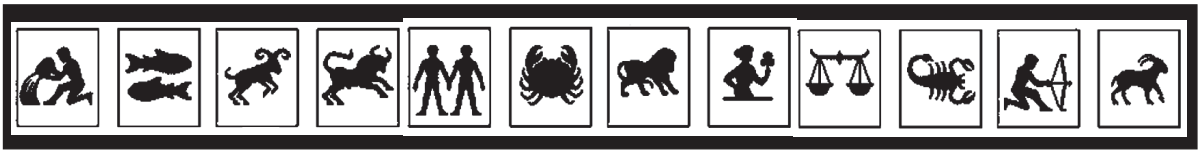

২৪ শে জুন (সোমবার) থেকে ৩০ শে জুন (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে শুক্র, মিথুনে রবি-রাহু, কর্কটে মঙ্গল-বুধ, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি। ধনুতে বক্রী শনি-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে বৃষে কৃত্তিকা নক্ষত্রে।

মেষ : নতুন উদ্যোগ, কীর্তি, যশ, প্রতিপত্তি। গৃহে পুণ্যকর্ম। সংবেদনশীল মন, পুত্র কল্যাণে বৈভব। বৈষয়িক বিষয়ে স্বজন সম্পর্কে অবনতি। শিক্ষক-সাংবাদিক -সাহিত্যিকের অতি আশা স্বপ্নভঙ্গ হতে পারে। শরীরের যত্ন নিন। উত্তেজক পরিবেশ পরিহার করুন।

বৃষ : কর্মজনিত যশ। দেব-দ্বিজ-গুরুজনে ভক্তি-শ্রদ্ধা। গোপনীয়তা, কৌশলী মন, অতৃপ্তভাব সময়ের অপচয়। আমদানি-রপ্তানি ও অংশীদারি ব্যবসায় ধীরে চলুন। নিজ পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক, যুক্তিসঙ্গত কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। জীবন সঙ্গিনীর অদূরদর্শিতায় ব্যর্থ মনস্কাম।

মিথুন : বিদ্যা-গীত-উৎসবে ধৈর্যচ্যুতি। পিতা-মাতার যত্নের প্রয়োজন। বিধর্মীর সঙ্গলাভে স্থানান্তর ও মনস্তাপ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে প্রতিবেশী ও মিত্র সাহচর্য। সন্তানসন্ততির প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণে প্রতিষ্ঠা। অহংকারহীন প্রজ্ঞার স্বাদ পাবে গোটা সমাজ।

কর্কট : সংকীর্ণতা, হীনম্মন্যতা, অসৎ সঙ্গ, অর্থনাশ, তর্ক, ঔদ্ধত্য পরিহার করে বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করুন। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার ঘাটতি না থাকলেও সহকর্মীর ব্যবহার মনঃকষ্টের কারণ। সপ্তাহের শেষভাগে সৎ বন্ধু সান্নিধ্যে মনের উৎফুল্লতা ও প্রশান্তি। তরল ও কেমিক্যাল ব্যবসায় ক্রমবর্ধমান উন্নতি।।

সিংহ : তেজস্বী, বিদ্বান, পুত্রবান, লোকমান্য, বন্ধুপ্রিয়, শত্রুঘ্ন, শান্তিকামী, মিষ্টতা, ও বাকচাতুর্যে পরিচিত মহলে সাধুবাদ প্রাপ্তি। বিলাসব্যসন, গৃহসজ্জা ও বাসনা তৃপ্তিতে ভরপুর মন। গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তায় সৌভাগ্যের নতুন দিশা। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন যোগ। কর্মে অনিশ্চয়তা। মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসায় যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

কন্যা : সৎ কীর্তি, বুদ্ধি, উদ্যম, গৃহসুখ, ব্যবসা, মানসম্মান রমণীর কারণে জলাঞ্জলি। বিভাগীয় প্রধান বিচারক, অধ্যক্ষ, প্রযুক্তিবিদ, ইনকাম ট্যাক্স আধিকারিকের মেধা ও দক্ষতার মেলবন্ধনে পাণ্ডিত্য প্রভাবে খ্যাতি ও বিজয়ীর সম্মান। সন্তানের পড়াশোনায় মনসংযোগের অভাব। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা শ্রেয়।

তুলা : শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক, দয়ার্দ্র ও সংবেদনশীল মন, মার্জিতরুচি সংস্কৃতিবোধ। পরিজনপ্রিয়, স্বজন বান্ধব ও বিদ্যার্থীর কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর কারণে সাংসারিক ছন্দপতন। সন্তানসন্ততির চালচলনে আধুনিকতার পরশ। আর্থিক শ্লথগতি। ঋণ ও শত্রুতা বৃদ্ধি। মাতার সুচিকিৎসায় বিলম্ব।

বৃশ্চিক : গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। সুরক্ষা ও বিক্রয় কর্মে কুহকিনীর মায়াজালে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব বৃদ্ধি। বিভিন্ন জনের সহায়তা, কুশলতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য। বাহনচালক ও প্রমোটারদের দুশ্চিন্তা মুক্তি।

ধনু : দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ব, প্রিয়জনের সঙ্গসুখ, উচ্চশিক্ষায় প্রবাস ও বিদেশ ভ্রমণের লোভনীয় হাতছানি। জীবন সঙ্গিনীর বৈষয়িক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি। আবেগপ্রবণ ও ক্রনিক রোগীদের সতর্ক থাকা দরকার, বিশেষত নিম্নাঙ্গের আঘাত বিষয়ে।

মকর : মাতার বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য পরিষেবায় পুত্রের মানসিক চঞ্চলতা, উদ্বেগ ও অবসাদ। ভ্রাতা-ভগ্নীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বৈষয়িক উন্নতি। জীবনসঙ্গিনীর জেদে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যয়াধিক্যের চাপ সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার ও দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ন। বাতজ বেদনা, রক্তচাপ ও হৃদযন্ত্রের চিকিৎসায় যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

কুম্ভ : শ্রদ্ধা, লোক সন্তুষ্টি, শিষ্টাচার, সৌজন্য, ধর্ম-কর্মে মনোবাঞ্ছা পূরণ। বিদ্যা, ব্যবসা ও জনকল্যাণে সাফল্যের বহু পালক যুক্ত হবে। আর্থিক সচ্ছলতায় বাহন ও সম্পদের সাধ পূরণের সম্ভাবনা। কার্যক্ষেত্রে সতর্কতা ও পুরনো প্রেমজ সম্পর্কে জটিলতা। উত্তেজক পরিবেশ ও আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলুন।

মীন : প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃ বিরোধিতায় বৈষয়িক জটিলতা। নীতিগত ব্যাপারে আপোশহীন মনোভাব প্রশংসার্হ। শৌখিন ক্ষুদ্র ব্যবসায় সাফল্য। কর্মপ্রার্থীদের সাফল্যে আরও সময় প্রয়োজন। বদমেজাজি ব্যক্তির সান্নিধ্যে স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন। বয়োজ্যেষ্ঠ কারো স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য